PUBLIC

উৎসর্গ

চিরহাস্যপুরবাসিনী

পরমারাধ্যা ৺মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

নিবেদন

'চিরন্তনীর জয়' উপন্যাসটি ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিন উক্ত পত্রিকার পত্রাঙ্কেই ইহা আবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে আমার অনেকগুলি গল্প এইরূপ আত্ম-গোপন করিয়া আছে। বর্ত্তমান প্রকাশকের আগ্রহাতিশয্যে ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত মূল আখ্যান-বস্তুটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি।

বিনীত

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়

লালগোলা রাজবাটী

১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩

চিরন্তনীর জয়

এক

"সন্ধ্যার ছবিটা চমৎকার হয়েছে, ভাই!"

চিত্রশিল্পী মৃদু হাসিল। মনোযোগের সহিত সে তখন তুলিকার সাহায্যে সন্ধ্যারাণীর চরণে গতিবেগের সঞ্চার করিবার জন্য বর্ণলেপ করিতেছিল।

একবার তুলিকার রেখাপাত করিয়া শিল্পী মণীশ হাসিয়া বলিল, "তুইত আমার কোন ছবিরই দোষ দেখতে পাসনি, বিকাশ। স্নেহের চোখে অন্ধকারটাকে আলো বলে মনে হয়।"

বিকাশ বলিল, "কি রকম?"

মণীশ বলিল, "রকম এই যে, ছাই পাঁশ যা আঁকি না কেন, তোর চোখে তার ভেতর দিয়ে আকাশের চাঁদের সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে।"

বিকাশ বলিল, "তাই নাকি? তার সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, আমার চোখ নেই, কেমন, না?"

মণীশ এবার খুব জোরেই হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তবে নাক তোর রাগ নেই? উদীয়মান কবি বিকাশচন্দ্রের সৃষ্টির সৌন্দর্য্যবোধ নেই, এ কথা যে বলে, তার সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণাই নেই। তামাসা না, সত্যি বলছিস, আঁকাটা ভাল হয়েছে? সন্ধ্যাকে জীয়ন্ত করে তুলতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে?"

বিকাশ বলিল, "মনে হচ্ছে? সত্যি বলছি ভাই, সুরসুন্দরী সন্ধ্যা যেন সত্যিই আকাশের কোল থেকে নেমে এসে ধরায় উদ্যানের সব আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছে। কি চমৎকার!"

চিরন্তনীর জয়

ঘরের মধ্যে আলো-ছায়ায় মেশা অন্ধকার—দ্বিপ্রহরে জানালা দরজা বন্ধ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে সন্ধ্যার আবেষ্টনকে পরিস্ফুট করিবার আয়োজন করা হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন আলোকের প্রদীপ্ত প্রভা সন্ধ্যার কল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

বিকাশ তাহার আবাল্য বন্ধু মণীশের প্রতিভায় বহুদিন হইতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল: মণীশ পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই দক্ষ চিত্রশিল্পী বলিয়া চিত্ররসরসিক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সন্ধ্যারাণীর চিত্রে সে যে কল্পনার পরিচয় দিয়াছে—বর্ণ ও তুলিকার সমবায়ে যে মধুর চিত্র আঁকিয়াছে—তাহার তুলনা বিকাশ খুঁজিয়া পায় না। বিকাশ সত্যই আজ বন্ধুর জন্য গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল। সে অবশ্য ছবি আঁকিতে পারিত না, কিন্তু তাহারও শিল্পী-হৃদয় ছিল। সে তাহার বন্ধুর ন্যায়ই চমৎকার বাঁশী বাজাইতে পারিত, কবিতা রচনাতেও তাহার বেশ হাত ছিল। এজন্য উভয় বন্ধুর মধ্যে প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। সমপ্রাণতাই বন্ধুত্ব ও প্রণয়ের দৃঢ় ভিত্তি। উভয়ের মধ্যে এই সমপ্রাণতা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

মণীশ কিছুক্ষণ নীরবে আপনারই অঙ্কিত চিত্রে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। পরে মৃদুস্বরে বলিল, "সৃষ্টিকর্ত্তার এই মানস কন্যাটিকে আমার বড় ভাল লাগে, বিকাশ।"

বিকাশ বলিল, "বিশেষ যখন সে সন্ধ্যার আকাশে বর্ষার ধারা নেমে আসে। কবি বলেছেন, 'লাজনম্র নববধূ সম,'—তোর ছবিটাতেও ঐ অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটা কি সুন্দর ফুটে উঠেছে! আমি ভবিষ্যৎ গুণে বলছি, তোর এ ছবিটার যা নাম হবে—যা হৈ চৈ পড়ে যাবে—তা এর আগে কখনও হয় নি।"

মণীশ বলিল, "মা কিন্তু মনে হচ্ছে উষাতে যে আনন্দ পেয়েছিলেন, এতে তা পাবেন না।"

বিকাশ বলিল, "কে, মাসিমা? তা না পাবারই কথা। ওঁরা চান আলো,—যেমন ঘর আলো করা বউ"—

কথাটা শেষ হইল না, বিকাশ বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। কি একটা অব্যক্ত যাতনা ও কাতরতার ভাবই না তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'এখানাও একজিবিশানে দিবি ত? বোধ হয় তোর উষার মত এরও জায়গা হবে প্রথম স্থানে। কি বলিস?"

মণীশ বলিল, "কি জানি বলতে ত পারিনি, সবই স্থযোগ আর বরাত!"

বিকাশ বলিল, "দূর গাধা! নিজেকে এত ছোট মনে করিস কেন বল দিকি? এই আপনাকে খাটো করে দেখটা আমাদের বাঙ্গালী জাতের মজ্জাগত হয়ে উঠেছে। কেন, কিসে আমরা ছোট? এই ধর না অনিলটার কথা, তুটো সাবজেক্টে ফার্ষ্ট ক্লাসের ফার্ষ্ট, আবার আর একটা সাবজেক্টে পরীক্ষা দেবে বলে তৈরী হচ্ছে"—

মণীশ বাধা দিয়া বলিল, "কে বলছে অনিল খারাপ ছেলে? তবে পাশের উপর পাশ দিয়ে কেবল বেকারের নাম্বার বাড়িয়ে কি ফল হবে বল দিকি? বিশেষ, আমাদের এই দেশে,—যেখানে ছেলে পাশ দিলেই অমনই তার ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় একটি অর্দ্ধাঙ্গিনী, আর"—

বিকাশ হাসিয়া বলিল,—"আর বছর বছর—আসে যেন প্রবল বন্যা! হাঃ হাঃ!"

বাহির হইতে নিলমণি ডাকিল, "দাদাবাবুরা, নাইতি খাতি হবে

না, বেলা যে দুপহোর ছাড়িয়ে গেলো—মাঠাকরুণ বকাবকি করতি নেগেছে।" নিলমণি বাড়ীর পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য, মণীশকে কোলেপিঠে মানুষ করিয়াছে।

মণীশ তাড়াতাড়ি বলিল, "কেও নিলুদা? এই যে উঠছি আমরা। তোমার বিকাশদাইত দেরী করিয়া দিলে—কুঁড়ের বাদশা! তুমি যাও, কলের ঘরে তেল টেল রেখে এসো।"

নিলমণি চলিয়া গেল। মণীশ হাসিয়া বলিল, "মার বকাবকি মানে কি বুঝলি ত? নিলমণিদার নিজের প্রাণটা ছটফট করছে,—কতক্ষণে তার এই নাবালক ভাই দুটো নেয়ে খেয়ে নেয়! হাঃ হাঃ!"

বিকাশ গাঢ়স্বরে বলিল, "বেঁচে থাকুক এখনও বুড়ো আরও অনেকদিন —অমন করে আপনার বলে দেখে কজন বাইরের লোক আজ কাল? গাঁয়ে যখন ছেলে বেলায় থাকতুম আমরা, তখন কতদিন কত বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে বুড়ো আমাদের প্রাণ দিয়ে—দৌরাত্মি অত্যাচারটা ত ছিল না কম আমাদের!"

সত্যই তাই।—

উভয়ে একই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সমাজে উভয়ের পিতৃ পিতামহের পরিচয়, মর্য্যাদা ও স্থান সমান পর্য্যায়ে বিন্যস্ত ছিল। একই গ্রামে দল বাঁধিয়া পুকুরে সাঁতার কাটা, নদীতে বাচ খেলা, প্রতিবেশীর বাগানের বাতাবীলেবু, ডাব, শশা, পেয়ারা চুরি করিয়া খাওয়া, আর তাড়া খাইলে নিলুদার পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করা। সে কথা কি ভোলা যায়!

তাহার পর গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে উভয়ে বিদ্যার্জ্জন করিয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিল। বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষা-গুলি আয়ত্ত করিবার জন্য আপনার কর্ম্মশক্তিকে নিয়োগ করিয়াছিল,

আর মণীশ তাহার শিল্পপ্রতিভা লইয়া সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম্-এ উপাধি লাভ করিয়া বিকাশ যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া অধ্যাপকতা গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হইতেছিল, মণীশ তখন শিল্পী সমাজে নাম করিয়া ফেলিয়াছে। শিল্পশিক্ষা-মন্দিরের প্রশংসা-লিপিও তাহার ললাটে তখন জয়পতাকা আঁকিয়া দিয়াছিল।

বিকাশের মাতাকে মণীশ নিজের জননীর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। বিকাশও মণীশের জননীকে নিজের আরাধ্যা জননীর ন্যায় জ্ঞান করিত। মণীশের পিতা ছিলেন না, তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—মণীশ শিল্পী প্রতিভার জয়মাল্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই—লোকান্তরে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। বিকাশের সে দুর্ভাগ্য হয় নাই। তাহার পিতামাতা উভয়েই জীবিত।

দিবস ও রাত্রির অধিকাংশ সময়ই উভয় বন্ধুর একত্র অবস্থান, পান ভোজন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। উভয় পরিবারই ইদানীং কলিকাতা সহরে অবস্থান করিতেছিলেন। সন্তানগণের শিক্ষা ব্যাপার উপলক্ষেই কলিকাতায় অবস্থান অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিকাশ কোনও দিন মণীশের বাসাতেই যাপন করিত। আবার মণীশও হয়ত উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন বিকাশের সহিত তাহাদের বাসাতেই আহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা করিত। এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত তাহাদের প্রগাঢ় প্রণয়—বন্ধুত্ব উভয় পরিবারের পরিজনবর্গকে আনন্দ ও প্রীতিদান করিত।

তাই যখন নীলুদা আসিয়া মায়ের তাড়ার কথা শুনাইয়া গেল, তখন বিকাশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওঠ্, ওঠ্, সত্যিই বেলা অনেক হয়ে গেছে, মাসীমা হয়ত এলেন ব'লে ছুটে। নে, রাখ তোর তুলি টুলি।"

চিরন্তনীর জয়

মণীশ তখনও গড়িমাসি করিতেছিল, বলিল, "হঁা, তুইও যেমন, মার এখানে আসতে বয়ে গেছে—তাঁর আজ বড়ি দেবার ধূম পড়ে গেছে—ওসব নীলুদার চালাকি।"

"মনি, আজ তোদের নাইতে খেতে হবে না নাকি ?"

মণীশের মাতা দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই, মণীশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে, হয়ে গেছে মা, এইবার যাচ্ছি আমরা।"

মাতা দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতরে দাঁড়াইলেন। স্বল্পান্ধকারে দৃষ্টির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া লইয়া তিনি পুত্রের অঙ্কিত চিত্রের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিলেন। পুত্রের অঙ্কিত প্রত্যেক চিত্র তিনি দেখিয়াছেন। মণীশ যে দক্ষ চিত্রকর বলিয়া সুধী-সমাজে পরিচিত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানিতেন। পুত্রের যশের কথা শুনিয়া মায়ের মন গর্ব্বে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। শুধু তাহাই নহে। শিল্পীদিগের অধিকাংশই বাধ্য হইয়া আবেষ্টনের প্রভাবে সুনীতির প্রভাব-বর্জ্জিত হইয়া উঠে, ইহা তিনি শুনিয়াছিলেন। এজন্য প্রথমতঃ তিনি একমাত্র সন্তানকে প্রলোভন-পূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই চিত্র-শিল্পের দিকে মণীশের প্রবল অনুরাগ দেখিয়া অবশেষে পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুমতি দিয়াছিলেন।

মণীশ চিত্রবিদ্যাগারে প্রবেশ করিয়া কখনও কোন প্রকার অবাঞ্ছিত সংসর্গে মিশে নাই, ইহা তিনি জানিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠ-গ্রহণ এবং গৃহে বসিয়া শিল্পের ধ্যান ছাড়া মণীশ এ পর্য্যন্ত সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অনেকে 'মডেল' ব্যতীত চিত্র আঁকিতে পারে না ; কিন্তু মণীশের সে সকল বালাই ছিল না। সে কল্পনার ধ্যানে এমন তন্ময় হইয়া যাইত যে, বস্তুতান্ত্রিক

আদর্শের প্রয়োজন তাহার হইত না। শিল্পীমহলে এজন্য মণীশের নাম ছিল "ভাল ছেলে!" অবশ্য একটু বিদ্রূপের রস দিয়াই তাহারা মণীশকে বিশেষিত করিত। মণীশ যে তাহা বুঝিত না, এমন নহে। কিন্তু তাহার দৃঢ় ও সবল অন্তর তাহাতে বিন্দুমাত্র আহত হইত না। জননীর স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি পুত্রের সকল কার্য্যে সকল সময়েই নিক্ষিপ্ত থাকিত। মণীশ যে নিজের চরিত্রকে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের আকর্ষণ হইতে অনাসক্ত রাখিয়া চলিতেছিল, এজন্য মাতৃহৃদয়ের গর্ব্ব অল্প ছিল না।

আরাধ্যা জননীকে তাহার চিত্রের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া মণীশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি দেখছ মা এত তন্ময় হয়ে?"

জননী চমকিত হইয়া বলিলেন, "দেখছিলুম? না—ও কিছু না। কি চমৎকার আঁকতে পারিস বাবা তুই! হাঁরে, সত্যিই এমনি মানুষের রূপ হয় বিধাতার সৃষ্টিতে?"

মণীশ অন্যমনস্কভাবে বলিল, "কি জানি।"

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "তা যদি হোতো মাসিমা, তা হ'লে কি করতেন আপনি?"

বিকাশের নয়নকোণে দুষ্টহাসি—মণীশের মুখমণ্ডল অসম্ভব গাম্ভীর্য্য ধারণ করিল।

প্রৌঢ়া জননী নিবিষ্ট চিত্তে অঙ্কিত চিত্রখানি দেখিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। চিত্রে অঙ্কিত সন্ধ্যারাণীর ন্যায় একটি দেবী-প্রতিমাকে যদি তিনি বধূ করিয়া আনিতে পারিতেন!

জননীর পক্ষে এরূপ চিন্তা অস্বাভাবিক নহে।

সে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ বোধ হয় মণীশের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন সে তুলিকা জলে ধৌত করিয়া আধারে তুলিয়া রাখিতেছিল।

"কি হ'ল, মা?"

চিরন্তনীর জয়

পুত্রের দীর্ঘায়ত নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি, মাতৃহৃদয়কে অনুশীলন করিবার জন্য বোধ হয় উদগ্র হইয়া থাকিবে।

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "হবে আবার কি? বড় সুন্দর করে এঁকিছিস্ ত বাবা।"

মায়ের প্রশংসায় মণীশের বুকখানা দশ হাত হইয়া উঠিল, সেত প্রশংসা নয়—সে যে দেবতার আশীর্ব্বাদ! জগতে মণীশের কাছে তাহার অধিক কাম্য বর ত কিছুই ছিল না।

উচ্ছ্বসিত মনোভাব গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি মুখখানা মায়ের অঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিল, "কেন মা, এ রকম সুন্দর করে ত ঊষার ছবিখানাও এঁকেছিলুম। তুমি ত তারেও সুন্দর বলেছিলে! তোমার কাছে আমার কোনটা অসুন্দর?"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, নয়ন পল্লব আর্দ্র হইল- ধুর বাল্যের স্বপ্নরাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে!

বিকাশ মানব মনের জটিল তত্ত্ব সংক্রান্ত অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ সম্প্রতি পড়িয়াছিল। অবস্থাটা গুরু গম্ভীর হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া সে সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "মাসীমার এইরকম একটি সুন্দর বৌ ঘরে আন্‌বার বড় ইচ্ছে হয়, না?"

মাতা বলিলেন, "তা কার না হয়, বাবা? কিন্তু তোরা যে ছেলে জন্মেছিস, তা কি হবার যো আছে?"

উভয় বন্ধু প্রাণখোলা হাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিয়া তুলিল।

দুই

"আরে, এ কি সৌভাগ্য,—বিকাশ বাবু যে? আসতে আজ্ঞে হোক, আসতে আজ্ঞে হোক!"

চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া দুই হস্তে প্রায় জাপটাইয়া ধরিয়া অনিলচন্দ্র বাল্য বন্ধু বিকাশকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। উচ্ছ্বাসের বেগ একটু প্রশমিত হইলে সে আবার বলিল, "তা, পথ ভুলে এ গরীবের কুঁড়ের দিকে যে?"

বিকাশ এতক্ষণে হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়া বলিল, "অনেক দিন পোলাও কালিয়া খেয়ে পান্তা ভাতে একটু মুখ বদলাতে এলুম, এই আর কি! তবুত আমি উব্‌জে এতটা পথ কল্‌কাতা থেকে এলুম।"

"মশাই এত দিন কি করেছিলেন শুনি? পাশের উপর পাশই দিয়ে যাচ্ছো শুনি—এবার আর এক ব্র্যাঞ্চে এম, এ দিচ্ছো—বিদ্বান, গরীয়ান, মহান্"—

"শয়তান, হনুমান,—বলে যা, বলে যা আর গোটা কতক কিছু! ষ্টুপিড কোথাকার! তোর কবির কল্পনার ত বাধা বিঘ্ন নেই। তা যাক্, ভালই করেছিস, এইছিস, আর দুচার দিন পরেই চলে যেতুম এখান থেকে এক ভিন্ দেশে। এত বেলায় চা খাবি নি বোধ হয়!

বিকাশ বলিল, "না, ও সব সেরে এসেছি কল্‌কাতায়। তা চলে যাচ্ছিস মানে?"

অনিল বলিল, "বলছি সব। চল, কাপড় চোপড় ছেড়ে নেয়ে আসি গিয়ে? পুকুরেই যাবিত, না এখানে টিউব ওয়েলের তোলা জলে?"

বিকাশ বলিল, "পাগল, এত বেলায় না খেয়ে এসেছি বুঝি? দেখছিস নি, নেয়ে এসেছি?"

অনিল বলিল, "কেন এলি শুনি, গাধা কোথাকারের! তা যাই করিস, ভাত খেতে হবেই আমার সঙ্গে তোর—এদ্দিন পরে দেখা। রেলের জার্ণিতে এমনি হয়ে এইছিস, কে বোলবে তোকে নেয়ে এইছিস।"

বিকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁ, যেন ঝোড়ো কাক, তা চল, নাইতে যাবি ত তুই, তোর সঙ্গে গিয়ে আর একবার মাথাটা ধুয়ে আসি। মা বাবা কেমন আছেন? চল, তাঁদের প্রণাম করে আসি।"

অনিল বলিল, "হাঁ তাঁরা ভাল আছেন। ওরে পচা, তেল গামছা এনে দে চট করে। বাবা খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছেন, বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করিস—নেয়ে এসে বাড়ীর ভিতর ত যাবিই তখন মার সঙ্গে—"

"চেঁচাচ্ছ কেন দাদা,—পচা ময়রার দোকানে—"

কথাটা সাঙ্গ হইল না, একটি তরুণী অন্দরের দিক হইতে আসিয়া গৃহদ্বারে পদার্পণ করিয়াই মাথায় একহাত ঘোমটা টানিয়া দুড়দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। পলায়ন কালে তাহার হস্ত হইতে তৈলাধারটি পড়িয়া গেল।

অনিল হাসিয়া বলিল, "আরে পালাচ্ছিস কেন রে তরু—কে এসেছে দেখনা এখানে। যাঃ সব তেলটা ফেলে দিয়ে গেল! বাঁদরী!"

বিকাশ মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল। এই যে তরুণী আকাশে বিদ্যুদ্দাম দীপ্তির মত চমকিয়াই মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল—তাহাকে অপরিচিত অজানা মনে করিয়া যে দন্তাগ্রে রসনা কাটিয়া দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঝাঁপিয়া পলায়ন করিল—এই কি তাহাদের বাল্য ও কৈশোর সহচরী ভগিনী তরলিকা? কাল তাহার যৌবন পুষ্পিত সুকুমার দেহে কি অভাবনীয় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন-রেখা টানিয়া দিয়া গিয়াছে!

বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিকাশ বলিল, "ও কি তরু? এত বড়টি হয়েছে?"

অনিলচন্দ্র হো হো হাসিয়া উঠিল, বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "কত বড়টা হোয়েছে বল দিকি? হাত তিন চার? ওরে গাধা, মেয়ে ছেলেদের বিয়ে হলে যখন মাথায় সিঁদুর দিয়ে ঘোমটা টেনে দেয়, তখনই এক গা গয়না পরে ওদের মস্ত দেখায়। নইলে বছর তিনেক আগে যাকে ছোট দেখেছিস, আজ তাকে বড় দেখছিস কি করে?"

এই সময়ে প'চা স্নানের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া গেল। অনিল বলিল, "তোকে এখন আর ঘাটে যেতে হবে না—সাণের উপর কাপড় ছেড়ে আসবো'খন, গিয়ে নিয়ে আসিস পরে।"

দুই বন্ধু গ্রাম্য পথ ধরিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশ্যে চলিল। যাইতে যাইতে বিকাশ বলিল, "তা আমায় দেখে এত লজ্জা কেন? চিন্‌তে পারে নি নিশ্চয়?"

অনিল বলিল, "তা বলতে পারিনি। তবে চিনতে পারলেও যে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কথা কইতো, তাও মনে হয় না। এসেছে দিন কতকের জন্যে—প্রতুল বাবু বদলি হচ্ছেন কি না, তাই রেখে গেছেন এখানে এই তিন চার দিন হোলো। তা ভাই কি বোলবো, এবার এসে যেন আর সে মানুষেই নেই—যেন মস্ত বড় গিন্নিবান্নী! হাঃ হাঃ!"

বিকাশ বলিল, "তাই নাকি? তরু!—সেদিনকার সেই ছোট্টো মেয়েটি?"

অনিল গম্ভীর হইয়া বলিল, "তামাসা না, সত্যিই তাই। আমাদের এই বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা যে কি ধাতু দিয়ে গড়া, তা ভাই বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদরাও ধরতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এই আছে ছোট্ট মেয়েটি, পিঠে বেণী দুলিয়ে এলো চুলে হেসে খেলে ছুটোছুটি করে

বেড়াচ্ছে,—যাই বিয়েটি হোলো, অমনই সংসারের সমস্ত ভারটা কেমন স্বচ্ছন্দে অল্প অল্প করে আপনার ঘাড়ে তুলে নিলে! বাস্তবিকই চমৎকার।”

বিকাশ বলিল, “তাইত, তুই যে ভাবে গদগদ হয়ে পড়লি একবারে। সত্যিই কিন্তু আমি তরুর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখলুম। মনে নেই ভাই, তুই আমি আর মণীশ—আমরা তিন বন্ধুতে ঐ ছোট্টো বোনটিকে নিয়ে কত ছেলেমানুষী খেলা খেলেছি? আহা, সে বাল্যকাল আর ফিরে আসে না?”

অনিল বলিল, “সবাই ও কথা ব'লে, বুড়োরা ত আপশোষ করে মরেই। এই দেখ, তুইও বলছিস, বাল্যকাল সত্যিই কি চমৎকার! কোন চিন্তা নেই, কোন ঝঞ্ঝাট নেই!”

“আহা মরি বাল্যকাল, কি সুখের কাল,—”

বিকাশ কবিতা আওড়াইতে সুরু করিতেই অনিল হো হো হাসিয়া বলিল “নে, নে থাম, ঢের হয়েছে জেঠামি!” পরে গম্ভীর হইয়া বলিল, “মণীশের কথা বলছিলি না? সে—সে—এখনও কি—”

বিকাশ গম্ভীরভাবে বলিল, “তার কথা বোলবো বলেই এসেছি তোর কাছে। চান করে নে চট করে, ততক্ষণ এই সানের ঘাটটায় বসি আমি মাথাটা ধুয়ে—”

অনিলের [illegible] হয় নাই, সে বাধা দিয়া বলিল, “না, না, এখনই বল্, মণীর কথাটা শোনবার জন্যে বড্ডো মনটা ব্যস্ত হয়েছে। ঘাটে কেউ নেই, বল।”

বিকাশ মুহূর্ত্তকাল নীরবে মাথায় ভিজা গামছা দিয়া মাথাটা মুছিয়া লইল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, “বোলবো আর কি, এ জীবনটাই ব্যর্থ করলে, নিজেও গেলো, মাকেও মারলে! এ কি বাবা, একটা স্মৃতি

নিয়ে এমনই করে ভরা জীবনটা কাটাতে হবে? তাও যদি বুঝতুম, ও দিকে কোন আশা থাকতো!"

অনিল মুখ ধুইয়া জলে নামিতেছিল, বলিল, "আশা? বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ও সব রোমান্স ত চলে না বিকাশ। গাড়োল! এটাও বুঝলে না যে, তরুর বাবা বিয়ে দিয়েছেন যখন, তখন আর তার নড় চড় ইহজীবনে নেই?"

বিকাশ বলিল, "আচ্ছা, তরু—"

অনিল ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "তরু? দেখ্, মেলোড্রামাটিক হস নি। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে—সে জানে বাপ মা দেখে শুনে যার হাতে দিয়েছেন তাকে, সেই তার সব—তরু কি ছিষ্টিছাড়া হবে?—না, মণীশের জন্য এর পর মডার্ণ গার্লদের মত স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের মামলা আনবে! হাঃ হাঃ! তুইও কি ওর মত নভেল পড়ে পড়ে বেহেড হয়ে গেছিস নাকি?"

বিকাশ অন্তরে একটু আঘাত পাইয়া বলিল,—"দেখ, ফড় ফড় করে অনেক গুলো কথা বলে গেলি ত—কিন্তু আমি যাই হই, তুইও এদ্দিন আইবুড়ো কাত্তিক হয়ে রইলি কেন মণীশের মত বলতে পারিস?"

চোর চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, অনিলেরও তদ্রূপ হইল। শুষ্ক মুখে আমতা আমতা করিয়া সে বলিল, "কে, আমি, আমি? আমার লেখা পড়াই এখনও শেষ হোলো না—আর তা ছাড়া আমি দেশের অজ্ঞান নিরক্ষরদের শিক্ষার ভার নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দোবো মনে করেছি।"

বিকাশ বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "কি, ব্রহ্মচারী হয়ে গেরুয়া চিমটে নিয়ে নাকি?"

অনিল বলিল, "ঠাট্টা না, সত্যিই। কেন, ছেলেদের শিক্ষার ভার নেওয়াও কি সংসার করার চেয়ে ছোট কাজ হোলো না কি?"

"কে বলেছে ছোট কাজ। তবে বিয়ে থা করে ঘর সংসার পাতালে যে ও কাজটাও সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না, তাও ত নয়। নে ওঠ এইবারে, চল বাড়ী যাই।"

দুই বন্ধু গ্রাম্য পথ ধরিয়া ঘরে চলিল। দিবা দ্বিপ্রহর, পথ প্রায় জনশূন্য, দুই পাশে ঝাউ ও দেবদারুর পাতার মধ্য দিয়া উন্মুক্ত বায়ু বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে সর সর শব্দ হইতেছে, মাঝে মাঝে দুই একটা কাকের কর্কশ স্বর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে, মাঝে মাঝে গ্রাম্য কুক্কুরের আওয়াজ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে, অন্যথা আকাশ বাতাস যেন নীরব নিঝুম হইয়া রহিয়াছে।

অনিল যাইতে যাইতে বলিল, "সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তা হলে বলি, মণীশের জন্যই আমার ঘর সংসার করতে মনে সরে না। খুনে যেমন মানুষ খুন ক'রে সারা জীবনটা অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরে, আমারও ঠিক তাই হয়েছে। ভাই, বড় মুখ ক'রে বাবার কাছে মণীশের হাতে তরুকে দিতে বলতে গিয়েছিলুম—বাবার সে ধনুর্ভঙ্গ পণের কথা আজও ভুলতে পারি নি—আর, আর, মণীশের সেদিনের মুখের চেহারা এখনও আমায় তিলে তিলে পুড়িয়ে মারছে—আমি বিবাহ কোরবো? বিয়ে করতে বলিস আমায় সব জেনে শুনে?"

বিকাশ বলিল, "না, তা বলিনি। তবে একটা যা হয় উপায় ত করতেই হবে, আর সেই জন্যেই তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলুম এখানে।"

অনিল বলিল, "তা বেশ করেছিস। কিন্তু করা যায় কি বল দিকি? সে কি সত্যিই তরুকে ভুলতে পারে নি?"

বিকাশ বিষণ্ণমুখে বলিল, "না, নিশ্চয়ই না—তাকে জানিস ত। মাসিমার শুকনো মুখ দেখে আমার আর ওদের বাড়ীতে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। আহা! বুড়ীর কেউ নেই, ঐ একটি ছেলে!"

অনিল অস্থির হইয়া বলিল, "তাই ত, কি হবে বল দিকি? আচ্ছা, আজকাল হিঁদু গেরোস্তোর ঘরে বড় সড় হয়েছে, লেখাপড়া গান বাজনা শেখেছে, এমন সুন্দরী মেয়ে ত ঢের পাওয়া যায়।—একটা—"

বিকাশ বলিল, "চেষ্টার ত কামাই নেই, কিন্তু ও যে নাম শুনলেই মারতে আসে। তা, এক কাজ করলে হয় না?—যো—সো করে ওকে একবার তরুর সংসার ধম্মো করাটা দেখিয়ে দিলে হয় না?"

অনিল বলিল, "দূর গাধা! তা কখনও সম্ভব হয়? তার চেয়ে আমি যা বললুম, ঐ রকমের একটা মেয়েকে যোগেযাগে ওকে দেখিয়ে দিতে হবে, বুঝলি? তা, আমি ত শিগ্‌গীর মাষ্টারী করতে যাচ্ছি যেখানেই হোক, দেখিনা, যদি সেখানে সন্ধান মেলে। কি বলিস?"

বিকাশ বলিল, "তাই হোক। আপাততঃ ওকে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে দেওয়া হবে না, তা হলেই সব বিগড়ে যাবে।"

অনিল ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "তা ত নিশ্চয়ই। যাক্, এর পর মতলব ঠাওরানো যাবে'খন, চল এখন খাইগে যাই। না, না, সে হবে না, এক সঙ্গে দুই জনে বসে খেতে হবেই,—যা পারিস।"

দুই বন্ধু আহার করিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

তিন

মণীশেরই মত দীর্ঘ চরণবিন্যাস করিয়া প্রফুল্লমনে শিষ দিতে দিতে বিকাশ মণীশেরই গৃহের অভিমুখে যাইতেছিল। তাহার মনটা আজ সভ্যই অত্যন্ত প্রফুল্ল। গলির মোড়টা ফিরিতেই সে দেখিল, নীলমণি বিষণ্ণ মুখে দোকানে যাইতেছে, তাহার হাতে একটা ছোট ধামা।

নীলমণির মুখের ভাব দেখিয়া বিকাশ থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের হাসিও অন্তর্হিত হইল, সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে নীলুদা, যাচ্ছ কোথায় ?"

নীলমণি প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "ছোড়দাবাবু নাকি ? বুড়ো হইছি, ঠিক ঠাওর পাই নি। তা যাও, মা আছে, দাদাবাবু বেরিয়ে গেছে, আমি চট করে দোকান থে আসতিছি।"

বিকাশ বলিল, "দাঁড়াও নীলুদা, মুখখানা অমন শুকনো শুকনো কেন ? কিছু হয়েছে নাকি ?"

নীলমণি বিষণ্ণভাবে বলিল, "আর ছোড়দাবাবু, মারে নিয়্যি গ্যালাম এযাত্রাডা দেখতিছি। কি যে হবে, দাদাবাবু !"

বিকাশ উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল "কেন মাসীমার কি কোন অসুখ করেছে ? কখন হোলো ? কালত দেখে গেলুম—"

নীলমণি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "অসুখ হইছে বটে, তবে শরীলির না। মনডার।"

বিকাশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ওঃ তাই বলো। ও কিছু না।"

নীলমণি বলিল, "তাই হোক দাদাবাবু, তাই হোক, মা ত না, সাক্ষাৎ জগধাত্তির, এ্যান্‌ধারা মা কারুর হয় দাদাবাবু? যাও তুমি যাও দিনি চট্ করে, মারে গিয়ে বোঝাও দিনি আপনি।"

বিকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "বোঝাবো? মাসীমাকে? কি বলছ নীলুদা, কিছু বুঝতে ত পারছি নি।"

নীলমণি দাঁড়াইল না, যাইতে যাইতে বলিল, "সারা দিনডা চোখির জল ফেলতিছে। দাদাবাবুরি কত ক'রে বোঝাতি নেগেছে ঐ গিয়ে ঘরে এড্ডা বৌ আনতি, তা দাদাবাবু খালি হাসতি নেগেছে"—

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি? আরে, তা বলতে হয়? যাচ্ছি আমি এখ্‌খুনি তাঁর কাছে, ও সব ঠিক করে দোবো'খন।"

বিকাশ দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। মনটা তাহার যতই প্রফুল্ল হইক, তবু যেন কেমন ভার ভার বোধ হইল। যে নির্ব্বন্ধাতিশয্য তাহার বন্ধুর, এ তুফানে কূলকিনারা পাওয়া ত নিতান্ত সহজ নহে। যাহাই হউক, এ বিষয়ে একটা হেস্ত নেস্ত না করিলে আর চলে না। বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য কোলে পিঠে মানুষ করিয়াছে, আজ তাহার মনে কি দারুণ ব্যথা! আর মাসীমা? উঃ কি নিষ্ঠুর মণীশ—পুত্রগতপ্রাণা স্নেহময়ী জননী, তাঁহার নয়নে জল? না, ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে। যদি ইহার জন্য মণীশের সহিত ঝগড়া করিতে হয়, তাহাও স্বীকার।

গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বিকাশ উচ্ছ্বাসভরে ডাকিল,—"মাসীমা! মাসীমা!"

বিকাশের আহ্বানে শ্যামাসুন্দরী ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে একখানি রামায়ণ। মধ্যাহ্নে আহার শেষে তিনি কোন না কোন গ্রন্থ পড়িতেন। সংসারের সহস্র কার্য্যের অবকাশেও তিনি কিছু পড়াশুনা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

হাস্যপ্রফুল্লমুখে বিকাশকে বারাণ্ডায় উঠিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হয়েছে, বিকাশ ? এত হাসি মুখ যে ?"

বিকাশ একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "এবার একজিবিশনে মণীশের ছবি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে, মাসীমা ! কল্যাণপুরের মহারাজা পাঁচ হাজার টাকায় সেটা কিনে নিয়েছেন !"

বন্ধুর এই সাফল্যলাভের গর্ব্ব ও আনন্দে বিকাশ যেন আজ আপনাকে কোন মতে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহার চোখে মুখে দুরন্ত হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

জননী দুই হাত মাথায় ঠেকাইয়া বোধ হয় মনে মনে সকল আনন্দ ও সম্পদের একমাত্র স্রষ্টাকে তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগত স্বামীর কথা মনে করিয়া তাঁহার নয়নযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। আজ তিনি থাকিলে উভয়ে এই অপূর্ব্ব আনন্দ ও তৃপ্তির রস ভাগাভাগি করিয়া লইয়া চরিতার্থ হইতে পারিতেন। মণীশের উপর তাঁহার কত আশাই যে নির্ভর করিত !

আনন্দের ও সাফল্যের সংবাদে মুহূর্ত্তের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেও, অভ্যস্ত সংযমের বলে তিনি সে আবেগ-চঞ্চলতাকে সংবরণ করিয়া লইলেন। উদ্গত অশ্রুবিন্দু বসনাঞ্চলে মুছিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আয় বাবা, বসবি আয়। এ সুখের খবর, মিষ্টিমুখ না করে ত যেতে পাবি নি।"

বিকাশ অধীর চরণে বন্ধু-জননীর অনুবর্ত্তী হইল।

মণীশ তখনও বাড়ী ফিরে নাই। মহারাজা তাহাকে মোটরে তুলিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়াছেন। অগ্রিম কিছু অর্থ আজই তিনি তাহাকে প্রদান করিতে চাহেন।

বিকাশের মুখে সকল কথা শুনিতে শুনিতে শ্যামাসুন্দরীর মাতৃহৃদয়

মুহুর্মুহু উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্কের মত এই ভরা আনন্দেও একটুক অতৃপ্তির এ রেখাপাত কেন? ইহাই কি বিধাতার বিধান? তিনি ষ্টোভ জ্বালিয়া বলিলেন, "বাবা, আজ তোদের জন্য ফুলকপির সিঙ্গাড়া ভাজব বলে ঠিক করেছি। সবই যোগাড় আছে, বস্, তোকে গরম গরম ভেজে দি।"

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "মাসীমা, মণীশ আসুক, একসঙ্গে বসেই খাব; সেই ভাল নয়?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "সে এলে তাকেও গরম ভেজে দেব। এখন তুই খা! সন্ধ্যের পর দু'তিন রকম পিঠে আর পায়েসের সঙ্গে কড়াই-সুঁটীর কচুরীও তৈরী করে দেব।"

বিকাশ আর আপত্তি করিল না। সে জানিত, এই অপরিমেয় স্নেহের আধার মাসীমাতার অন্তরে সামান্য প্রতিবাদ করিয়া বেদনা দেওয়া তাহার সাধ্যের অতীত।

ময়দা মাখা ছিল। ভিজা পরিস্কৃত গামছার দ্বারা আবৃত ময়দার তাল বাহির করিয়া শ্যামাসুন্দরী সিঙ্গাড়ার জন্য নেচি কাটিতে বসিলেন। কপির পুর পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল।

ক্ষিপ্রহস্তে কাজ সারিয়া শ্যামাসুন্দরী সিঙ্গাড়া ভাজিতে বসিলেন।

বিকাশ ততক্ষণ বন্ধুর শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিতেছিল। আধুনিক অ[illegible]শিল্পীদিগের সহিত তাহার যে অনেক বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে, এ কথা [illegible]জ যদি দেশের লোক স্বীকার না করে, ভবিষ্যযুগের বংশধরগণ তাহা [illegible]শ্চয়ই মুক্তকণ্ঠে বলিবে। এমন চরিত্রবান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সংযত-জীবন, [illegible]তিভাশালী চিত্রশিল্পী কমই দেখা যায়। প্রতীচ্যের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে [illegible]াচ্যের মনোভাব লইয়া কম চিত্রশিল্পীই চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকে। কল্পনার [illegible]য়ারথে চড়িয়া মণীশ যে সকল সৌন্দর্য্য, তুলিকা ও বর্ণের সাহায্যে রূপ

দিতেছে, তাহার তুলনা হয় না। নবীন চিত্রশিল্পীদিগের কেহই যে তাহার সমকক্ষ নহে, এ কথা সে উচ্চকণ্ঠে সহস্র সহস্র সুধী-বৃন্দের সম্মুখে বলিতে কুণ্ঠিত নহে।

শ্যামাসুন্দরী মুগ্ধচিত্তে বন্ধুর কণ্ঠোচ্চারিত বন্ধুর প্রশংসাগীতির গুঞ্জন-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। বিকাশ ও মণীশের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব যে শ্যামিকা-রহিত স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং অকৃত্রিম, ইহা তিনি ভাল রূপেই জানিতেন।

উচ্ছ্বাসভরে বিকাশ বলিয়া উঠিল, "মাসীমা, আপনি দেখ্‌বেন, আর কিছুদিন পরে মণীশের প্রশংসায় সারা বাঙ্গলা দেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ ভরে যাবে। ওর শিল্পসাধনা অসাধারণ, মাসীমা।"

জননীর বক্ষোদেশ মথিত করিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল।

স্বামীর একমাত্র আশীর্ব্বাদী এই শতদলটি আজ রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে, এ সময়ে তিনি নাই। তার পর এখন পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূকে লইয়া আনন্দ করিবার উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। কিন্তু তিনি পুত্রের ধনুর্ভঙ্গ পণ জানিতেন। সে বিবাহ করিতে সম্মত নহে। কখনও করিবে না এমন কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ না করিলেও বন্ধুর কাছে সে যাহা বলিয়াছে, তাহাতে বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি মণীশের নাই, ইহাই প্রকারান্তরে জানিয়াছিলেন। তাই এই সুসংবাদের সঙ্গে তাঁহার মনের এক প্রান্তে অস্বস্তির কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

গরম গরম সিঙ্গাড়া পরিবেষণ করিতে করিতে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "এইবার তোর বন্ধুর একটা বিয়ের যোগাড় কর। আর তোর মায়ের জন্য একজন দোসর এনে দে।"

বিকাশের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে সিঙ্গাড়া মুখে দিল। তার পর চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিল, "কেন মাসীমা, আমরা মন্দ কি আছি ?"

শ্যামাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "এ যুগে তোদের যে কি মতিগতি হয়েছে, বলতে পারিনে। সংসারে থাক্‌তে গেলে বিয়ে করা দরকার, সে কথাটা তোরা আমলেই আনতে চাস্ না।"

বিকাশ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "সকলেরই বিয়ে করতে হবে, এমন কোন বিধান আছে, মাসীমা ?"

"তা আছে বৈ কি, বাবা। তোরা লেখাপড়া শিখেছিস্। আমরা মুখ্‌খুসুখ্‌খু মানুষ। কিন্তু আমরা এটুকু বুঝি, যারা কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দিয়ে, দায়িত্ব এড়িয়ে সংসারে চল্‌তে চায়, তারা কাপুরুষ। তাই তারা বিয়ে না করে যে জীবন যাপন করে, তাকে আর যে কেউ প্রশংসা করুক, আমি করিনে, বাবা।"

কয়েক মুহূর্ত্ত বিকাশ তাহার জননীসমা এই মাতৃমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। সে দেখিল, শ্যামাসুন্দরীর সুগৌর আনন ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার নয়নের দৃষ্টিতে দৃঢ়তাভরা একটা বিশ্বাসের দীপ্তি সমুজ্জ্বল।

বিকাশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর বলিল, "আচ্ছা, মাসীমা! ভীষ্ম ত বিয়ে করেন নি, তিনি কি কাপুরুষ ছিলেন ?"

শ্যামাসুন্দরীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কড়া হইতে সিঙ্গাড়াগুলি ঝাঁঝরীতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "ওরে বোকা ছেলে! সবাই কি ভীষ্মদেব হয় ? পৃথিবীতে একটা ভীষ্মই দেখা যায়—গণ্ডায় গণ্ডায় নয়। তার পর কি অবস্থায় পড়ে তিনি বিয়ে করেন নি, সে কথাটা ভুলে গেলে চল্‌বে কেন, বাবা ?"

বিকাশ মুগ্ধচিত্তে বন্ধু-জননীর কথার সারবত্তা চিন্তা করিতে লাগিল। বাস্তবিক এ দিক দিয়া সে কোনও দিনই ত চিন্তা করে নাই!

শ্যামাসুন্দরী বলিয়া চলিলেন, "যাঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন, তাঁদের কথা ধরিনে। যারা চিররুগী বা সত্যি সত্যি অত্যন্ত গরীব, তাদের কথাও ছেড়ে দিলাম। কিন্তু যারা সমর্থ, কর্ম্মী, সুস্থ, সবল মানুষ, সংসার ছেড়ে যারা চলে যায় নি, তারা কেন বিয়ে করে সংসারের প্রধান কর্ত্তব্য পালন করবে না, তা আমি বুঝতে পারি নে তোরা এখন দেশমাতার সেবার কথা বলে থাকিস্। জাতির ভালমন্দের জন্য চিন্তা করিস; কিন্তু সকলেই যদি তোদের মত অবস্থাতেও বিয়ে না করে, তবে কিছুকাল পরে, এই দেশ বা জাতি কোথায় থাক্‌বে বল্‌তে পারিস্, বাবা?"

তর্ক করিবার জন্য হয় ত এ যুক্তির খণ্ডনও ছিল; কিন্তু বিকাশের মন আজ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিল না। এই স্বল্পভাষিণী, স্বল্পশিক্ষিতা বাঙ্গালী জননীর মুখ হইতে সে যে কথা উচ্চারিত হইতে শুনিল, সত্যই এমন কথা সে আর কাহারও মুখে পূর্ব্বে শুনে নাই।

সে বলিয়া উঠিল, "আমি মণীশকে ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌ব, মাসীমা। আর আমি নিজেও আপনার আদেশ পালন করবার চেষ্টা করব।"

শ্যামাসুন্দরীর মুখ প্রসন্ন হইল। তিনি বলিলেন, "তাই কর বাবা, তাই কর। আমি আর ক'টা দিন! এ সময়ে যদি ঘরে লক্ষ্মী আনতে না পারি, মণীকে যদি স্থিতভিত করে দিয়ে যেতে না পারি, তবে আর কবে কি কোরবো বাবা? তোরা ত অবুঝ নোস বাবা।"

বিকাশ বলিল, "সব বুঝি মাসীমা, কিন্তু কি কোরবো বল, ও যে বা[illegible] সাধনার সময় ওসব পায়ে পায়ে জড়ালে সিদ্ধি হবে না।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তা জানি। জানি বলেই এতদিন ত পীড়াপীড়ি করিনি, বাবা। কিন্তু তোরাইত বলছিস, এখন মণীর নাম হয়েছে,

যশ হয়েছে। মা দুর্গার আশীর্ব্বাদে এখন দু'পয়সা রোজগারও করছে, এখন ত আর ও কথা বল্‌লে চলে না। আমি যে আর সবুর করতে পারছি নি বাবা—ঘর আলোকরা বৌ এনে বৌএর চাঁদমুখ দেখবো, যাহোক দুটো ওদের খুদকুঁড়ো হলে বুকেপিঠে করে প্রাণ জুড়ুবো,—তাও আমায় করতে দিবিনি তোরা ?”

বিকাশ কি জবাব দিবে ? জননী ত পুত্রের মনের গোপন কোণের কথাটি জানেন না—সে যে কেন নবীন যৌবনে সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, তাহা ত তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া সে বলিতে পারে না। যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত সে বলিল, “নিশ্চয়ই দোবো মাসীমা। আজ থেকে তোমায় কথা দিচ্ছি মাসীমা, আমি মণীকে বুঝিয়ে বোলবো, তাকে রাজী করাবো, তুমি ভেবো না মাসীমা।”

জননীর মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি বিকাশের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, “বেঁচে থাকো বাবা দীর্ঘজীবী হয়ে, সোনার দোত কলম হোক তোমার ! আজ যে আমায় কি আনন্দ দিলি বাবা, কি আর বোলবো। তোরা বুঝিয়ে বল্‌লেই আমার পাগলা ছেলে রাজী হবেই।”

শ্যামাসুন্দরী চলিয়া গেলেন , বিকাশ বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। স্নেহময়ী জননীকে কথা দিয়া সে কি ভাল করিল ? মণীশ কি এতই হৃদয়হীন যে, জননীর অন্তরের এই আকুল আকাঙ্ক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে না ? নিশ্চয়ই করিবে, তাহাকে বিবাহে সম্মতি দিতেই হইবে। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব, সকলের অনুরোধ উপরোধ সে কি তুচ্ছ করিবে ? কি এমন তার ধনুর্ভঙ্গ পণ ?

কিন্তু বিকাশ উত্তমরূপেই অবগত ছিল, তাহার বন্ধুকে বিবাহে সম্মত করান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মণীশ কেন চিরকুমার অবস্থায়

থাকিতে চাহে, স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া যে জননীকে সে সমগ্র অন্তর দিয়া ভক্তি করে, ভালবাসে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট, তৃপ্ত করিতে কেন সে অসমর্থ, তাহার ইতিহাস বিকাশের অগোচর ছিল না। সে জানিত, মণীশের মত দৃঢ়চেতা মানুষকে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা কঠিন কার্য্য। বাল্যের প্রণয়—প্রধানতঃ একতরফ হইলেও, মণীশের অন্তরে গভীর ভাবে দাগ কাটিয়া আপনার যে স্থান করিয়া লইয়াছিল, সে চিহ্ন সম্পূর্ণ ভাবে বিকাশের বন্ধুর হৃদয়ে এখনও বিরাজিত। মণীশের বিশ্বাস, বাল্যকাল হইতে যে বালিকাকে সে আপনার ক্রীড়াসঙ্গিনীরূপে মনোমন্দিরে স্থান দিয়াছিল, কৈশোরে তাহার স্মৃতি মণীশের অন্তরে জীবনযাত্রার সহচরীর আসন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের মিলন সম্ভবপর হয় নাই। চিত্রশিল্পীর করে, মণীশের মানস-সুন্দরীর ধনী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত পিতা তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিতে চাহেন নাই।

মণীশ তরলিকাকে তাহার পাচ বৎসর বয়স হইতে দেখিয়া আসিয়াছিল। কার্য্যোপলক্ষে পল্লী-সহরে তরলিকার পিতা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। পল্লী-সহরের আদালতে তিনি শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। মণীশের পিতা সম্ভ্রান্ত তালুকদার ছিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। একই সমাজভুক্ত এই দুই কায়স্থ পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব নিবিড় হইবার পথে কোনও সামাজিক ব্যবধানও ছিল না। বিকাশ অন্য পল্লীতে থাকিলেও সতীর্থ মণীশের বাড়ীতে প্রত্যহ যাতায়াত করিত। সুতরাং তরলিকার জ্যেষ্ঠ সহোদর অনিলের সহিত তাহারও মিত্রতাবন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল। মণীশ, বিকাশ ও অনিল জেলা বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। তিনটি কায়স্থ পরিবারের নিবিড় সখ্যতার আর একটি প্রধান কারণ ছিল,—বিকাশের

চিরন্তনীর জয়

পিতা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে দীর্ঘকাল সেই জেলার নানা উন্নতিকর প্রতিষ্ঠানের নায়ক স্বরূপ ছিলেন। এই পবিত্রচেতা পণ্ডিতটির সদ্গুণরাশিতে তরলিকা এবং মণীশের পিতা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কৈশোর যখন প্রথম যৌবনের সন্ধিক্ষণে পদক্ষেপ করে, কল্পনা তখন তাহার পাখা মেলিয়া অনন্ত আকাশ পথে উড়িয়া চলে। তখন সম্ভব অসম্ভব, স্থান, কাল, পাত্র কিছুই বিচারের মধ্যে আনে না। বিশেষতঃ যাহার মন সমধিক কল্পনা-প্রবণ, বাস্তব জগতের বিধানকে তাহার মানিয়া চলিবার মত সুস্থ সবল জ্ঞানেরও অনেকটা অভাব দেখা যায়।

মণীশ বাল্যকাল হইতেই সমধিক কল্পনা-প্রবণ ছিল। ভবিষ্যতে যে কবি বা চিত্রশিল্পী হইয়া যশঃ অর্জ্জন করিবে, তাহার অনুভূতি তীব্রতম হইয়া অনুক্ষণই কল্পনারাজ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকিতে চাহে। বালিকা তরলিকার প্রতি কিশোর মণীশের মনে প্রথমাবধিই একটা আকর্ষণ সঞ্জাত হইয়া আসিতেছিল। মণীশের পক্ষে তখন এই আকর্ষণের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না। তরলিকা তখন বালিকামাত্র, কিন্তু তথাপি তাহাকে দেখিবার আগ্রহ, তাহার সহিত খেলা করিবার সুযোগ পাইলে মণীশ যেন কৃতার্থ হইয়া যাইত।

অবশ্য বিকাশও বন্ধুর সহোদরাকে স্নেহ করিত, ভালবাসিত; কিন্তু সহোদরার প্রতি জ্যেষ্ঠের যে নির্ম্মল স্নেহ থাকে বিকাশের স্নেহ তাহারই অনুরূপ মাত্র। মণীশের স্নেহও সেই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্ততঃ তরলিকার কৈশোর প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মণীশ তদতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার প্রেরণা অনুভব করে নাই।

কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার পর, আর্ট কলেজে তিন বৎসর যাপনের অবকাশে বিংশতি বর্ষ বয়সে দেশে আসিয়া পঞ্চদশবর্ষীয়া তরলিকাকে

যখন সে নূতন করিয়া দেখিল, তখনই মণীশের মনে হইল, এই তরুণীই তাহার জীবনের মানসী রাণী। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার শিল্প প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে; এবং ইহাকে না পাইলে, তরলিকা পত্নীরূপে তাহার গৃহ আলোকিত না করিলে, তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বিকাশের পিতা তখন হিন্দু স্কুলে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। মণীশের পিতা পরলোকের যাত্রী।

চিত্তের এই নিগূঢ় ব্যাপারটা মণীশ তখন আবাল্য বন্ধু অনিল ও বিকাশের নিকট ব্যক্ত করিল। কথাটা শুনিয়া অনিল পর্য্যন্ত উৎসাহ দিল। তাহার সহোদরার সহিত বন্ধুবর মণীশের বিবাহে কোন প্রতিবন্ধকতাই হইতে পারে না। মণীশের পিতা একমাত্র সন্তানের জন্য বার্ষিক ৮ হাজার মুদ্রা আয়ের যে সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কে ৫০ হাজার টাকার যে পাশ বহি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মণীশের মত রূপবান, গুণবান ভবিষ্যযুগের উদীয়মান চিত্রশিল্পীর করে যে-কোনও ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন।

কিন্তু অনিলের প্রমুখাৎ কথাটা উত্থাপিত হইবামাত্র পিতা বলিয়া দিলেন, এ বিবাহ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। একমাত্র কন্যাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহেন। মণীশের অর্থ, চরিত্র, গুণ প্রভৃতি থাকিলেও, চিত্রশিল্পীর করে তিনি তরলিকাকে কখনই সম্প্রদান করিতে পারেন না।

মণীশের নিকট এই প্রত্যাখ্যানের নিদারুণ সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। কথাটা বিকাশ ও অনিল ব্যতীত অন্য কেহ জানিতে পারে নাই। এমন কি মণীশের বিধবা জননীও এ বিষয়ের বাষ্পমাত্র অবগত ছিলেন না। অপ্রিয় সংবাদ সুতরাং বাহিরে প্রচারিত হইতে পারে নাই।

উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী কোনও সুপাত্রের করে তরলিকাকে সম্প্রদান করিয়া তাহার পিতা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তদবধি মণীশ আর দেশে আসে নাই। তাহার সকল আশার সমাধি না হইলেও, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা ব্যর্থ হওয়ায় সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সারা জীবনের মত সে কৌমার্য্যকে বরণ করিয়া লইবে—বিবাহ সে কখনও করিবে না। তবে, কেন তাহার এই বৈরাগ্য, সে সংবাদ বিকাশ ও অনিল ব্যতীত আর কেহই অবগত ছিল না।

চার

বলি বলি করিয়াও বিকাশ কয়েক দিন বন্ধুর কাছে বিবাহ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পারে নাই। কিছু দিন হইতে আর্ট স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদিগের সমবায়ে একখানা নাটকের অভিনয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণের একটা প্রস্তাব হইয়াছিল। যে সকল ছাত্র শিল্প-বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া, অভিনয়ের উপযোগী শক্তি ও সামর্থ্য যাহাদের আছে, তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষ অভিনয়ের জন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। মণীশ কোনও দিন অভিনয় করে নাই। তবে তাহার আকৃতি ও আবৃত্তি শক্তি সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। উপরোধ-অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মণীশ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসে মনোরমা-চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিল। তাহার আননে এমন একটা বিশিষ্ট ও সুকুমার মাধুর্য্য ছিল যে, নারী চরিত্রের ভূমিকায় সে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে, এ বিষয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে মতভেদ ছিল না।

শিল্প-বিদ্যালয় হইতে সে অনুরুদ্ধ হইয়াছে, এ সংবাদ সে জননীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিল। মাতা এই নির্দ্দোষ অভিনয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে পুত্রকে অনুমতি প্রদান করিলেন। বন্ধু বিকাশও তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল।

তন্ময়তা মণীশের প্রকৃতি-দত্ত গুণ। সুতরাং মনোরমার ভূমিকায় সে নিমগ্ন হইয়া রহিল। বিকাশ এ সময়ে তাহার একাগ্রতাকে অন্য প্রস্তাবের

দ্বারা আহত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল না। বন্ধুর জননীকেও সেই কথা বলিয়া সে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মণীশ বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনার সহিতই সবিশেষ পরিচিত ছিল। সে বিশ্বাস করিত, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী রসস্রষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্যে কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা মানুষের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়—এক একটা বিশিষ্ট যুগেই এমন শক্তিধর মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বাহ্ণে মনোরমা চরিত্রকে সম্যকরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য সে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহারই ধ্যানে বিভোর হইয়া গেল।

বিকাশ দেখিত, ভূমিকার অংশ আবৃত্তি করিবার সময় মণীশ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছে। সে যে তরুণ যুবক, সে কথা যেন মণীশের জ্ঞানের অতীত হইয়া গিয়াছে। যে যুগের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী-মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেই যুগের ভাবধারার আবেষ্টনে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া সে যেন ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মনোরমার সত্তায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

অভিনয়ের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। কোনও রঙ্গালয় অভিনয়ের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। মণীশ চিত্রজগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিনয়-জগতে বিচরণ করিতেছিল। বিকাশ তাহার জননী ও মাসীমাতা —মণীশের জননীকে, অভিনয় দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না।

বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রসবেত্তা সুধীসমাজও এই অবৈতনিক শিল্পী-সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনের জন্য সমাগত হইলেন। বিকাশ আশা-স্পন্দিত হৃদয়ে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল।

চিত্রশিল্পীদিগের অভিনয়। বেশভূষা প্রভৃতি যুগোপযোগী হইয়াছিল।

কিন্তু দর্শকবৃন্দ মনোরমার প্রথমাবির্ভাব হইতেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িল। কণ্ঠস্বর, গতিভঙ্গী, বলিবার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় একজন যুবক নারীর ভূমিকা অভিনয় করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভার মানসকন্যা মনোরমা যেন জীয়ন্ত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত। বিকাশ—যে সারাজীবন ধরিয়া বন্ধুর জীবনযাত্রার প্রতি পর্য্যায়ের সহিত সুপরিচিত—সেও সবিস্ময়ে, গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে বন্ধুর অপূর্ব্ব অভিনয়-দক্ষতায় আত্মবিস্মৃত হইল।

মনোরমা-চরিত্রের মধ্য দিয়া সাহিত্যসম্রাট যে অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র অন্তর দিয়া সাধনা না করিলে, এমন দক্ষতার সহিত তাহার শরীরিণী মূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দর্শকবৃন্দের—রসিক সমাজের জয়ধ্বনি রঙ্গমঞ্চকে মুহূর্মুহু কম্পিত করিয়া তুলিল।

বিকাশ বুঝিল, এতদিন ধরিয়া কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াও মনোরমা চরিত্রের যে অন্তর্নিহিত মূল সৌন্দর্য্য সে ঠিক ধরিতে পারে নাই, মণীশের অভিনয়-নৈপুণ্যে সেই পরম তত্ত্বটি তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। মণীশের শিল্পপ্রতিভার অভিব্যক্তিতে সে আনন্দে, বিস্ময়ে চমৎকৃত হইয়া গেল।

কখনও সরলা বালিকা, কখনও তরুণী সুন্দরী, আবার কখন বা প্রৌঢ়া জ্ঞানবৃদ্ধা নারীর মূর্ত্তিতে এই মনোরমা কাব্য-সাহিত্যে যে সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত উৎস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে বুঝিবার মত সাধনা

বিকাশ এতদিন করিতে পারে নাই, এ দুর্ব্বলতা, এ দৈন্য সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

আর একটি সত্য বিকাশকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। মনোরমার ভূমিকায় অভিনয়কালে মণীশ মনোরমার মুখ দিয়া তাহার রহস্যাচ্ছন্ন জীবনের পরিচয় যে ভাবে ব্যক্ত করিতেছিল, তাহার তরুণ জীবনের কামনাশূন্য হৃদয়ের পরিচয় যে ভাবে প্রকাশ করিতেছিল, তাহা হইতে বিকাশ বন্ধুর বিবাহ সম্বন্ধে দৃঢ় অনিচ্ছা যেন আরও সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিল।

মনে এই চিন্তা জাগিবামাত্র সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। মণীশকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। সে সংসারী হইয়া স্থিতিশীল জীবন যাপন করুক, এ কামনা সর্ব্বক্ষণই তাহাকে প্রেরণা দান করিত। মণীশ সংসারী না হইলে বিধবা জননী হৃদয়ে তীব্র আঘাত পাইবেন, ইহা সে জানিত। সে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছে যে, বন্ধুকে সে প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারী করিয়া দিবে। কিন্তু আজিকার মনোরমার ভূমিকায় মণীশ যেরূপ আন্তরিক ভাবে অভিনয় করিতেছিল, তাহাতে বোধ হইল, সে যেন তাহার নিজের জীবনকেই মনোরমার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অভিনয়ের সমাপ্তি কখন হইয়াছিল, বিকাশের সে দিকে খেয়াল ছিল না। সহসা বন্ধুর করস্পর্শে সে সচেতন হইয়া দেখিল, রঙ্গালয় প্রায় জনশূন্য।

মণীশ হাসিয়া বলিল, "বাড়ী যাবিনে? মা, মাসীমা ডাকছেন যে?

সেই সহৃদয়, প্রশান্তশ্রী, মধুরভাষী বন্ধু!—মনোরমা কোথায় গেল?

বিকাশ তাড়াতাড়ি অপ্রতিভের মত উঠিয়া দাঁড়াইল।

মণীশ বলিল, "তুই অভিনয় দেখিস্ নি বুঝি? খালি ঘুমুচ্ছিলি?"

বিকাশ দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "মণি, একটা কথা রাখবি ভাই—

কিন্তু সহসা কথার মোড় ঘুরাইয়া সে বলিল, "না, এখন থাক্। চল, মা, মাসীমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি।"

মণীশ মুহূর্ত্ত বন্ধুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোর কি হয়েছে বল ত ?"

বিকাশ মণীশের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "সে হবে'খন। তোর কাছে ত গোপন কিছু নেই। বলছিলুম কি, সত্যই কি মনোরমার মত মন থেকে পৃথিবীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা তাড়িয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিবি ?"

হঠাৎ মণীশের মুখমণ্ডল কালো আঁধার হইয়া আসিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া গম্ভীরকণ্ঠে সে বলিল, "হঠাৎ এ প্রশ্নটা উঠলো কেন বলতে পারিস ?"

বিকাশ অনুযোগের স্বরে বলিল, "হঠাৎ না, সত্যিই জিজ্ঞাসা করছি। মানস প্রতিমার পূজো ত যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন ?"

মণীশ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "মানসের সিংহাসনে একবার যে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়, তাকে কি আর নামানো যায় ?"

বিকাশ বলিল, "কেন, প্রতিমার ত বিসর্জ্জনও হয়। বিশেষ সে প্রতিমার যদি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারা যায়, যদি সে প্রতিমা অন্যের চণ্ডীমণ্ডপ আলো করে থাকে, তা হলেও তাকে স্মরণ করায় পাপ হয় না ?'

মণীশ প্রথমে কোন উত্তর দিল না। পরে বলিল, "তোর সঙ্গে বকতে পারি নি, আমি, থিয়েটারে যে বকান বকেছি, আর শক্তি নেই বলবার নে চল, রাত হয়েছে, মা ওঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের জন্যে।"

বিকাশ নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। সে বুঝিল, মনের এ অবস্থায় সে বন্ধুর মন ফিরাইতে পারিবে না। তখন সে সকল অঘটন ঘটনে শক্তিমান সর্ব্বশক্তিমানের কাছে মনে মনে আন্তরিক প্রার্থনা করিল যেন তিনি অন্ধকারে একটা পথ দেখাইয়া দেন !

পাঁচ

সেদিন মেঘমেদুর অম্বরের বাদল-ধারায় কলিকাতা সহর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ষাকাল নহে, ফাল্গুনের প্রথম আবির্ভাবেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বর্ষাকালের মতই বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিল। প্রভাত হইতেই বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল; কখনও মৃদু, কখনও বা প্রবল ধারায় বারিপাত হইতেছিল। মধ্যাহ্নকালেও আকাশের অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, যেন সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই।

মণীশ আজ একবারও বাটীর বাহির হইতে পারে নাই। বিকাশ অন্য দিনের মত আজ তাহাদের বাসায় ঠিক সময়ে আসিবার অবকাশ পায় নাই। একখানি নূতন চিত্রে বর্ণলেপের প্রয়োজন ছিল। আকাশের অনিশ্চিত অবস্থা এবং দিবার অস্পষ্ট আলোকে সে আজ উপযুক্ত বর্ণলেপের সুবিধা পাইতেছিল না।

অপরাহ্নের দিকে তুলিকা ত্যাগ করিয়া মণীশ বাতায়নের ধারে এক-খানি আরাম-কেদারা টানিয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। আকাশে মেঘের কালো ছায়া জানাইয়া দিল, আজ বৃষ্টি ধরিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

কবির কাছে বর্ষাঋতু প্রিয়। আকাশে মেঘ, পৃথিবীর বুকে বর্ষণধারা, উচ্ছৃঙ্খল্ বাতাস উন্মদবেগ কবির চিত্তকে অভিভূত করে বলিয়া প্রকাশ। মণীশের কবি-চিত্ত বোধ হয় তাই সারাদিনের পরিশ্রমের অবকাশে একান্ত ভাবে প্রকৃতির এই উদ্দাম লীলা উপভোগ করিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে সজল মেঘের বুকে দামিনীর দীপ্ত হাস মৃদু দিবালোকে

বিধবার হাস্যের ন্যায় ঝলসিত হইয়া উঠিতেছিল। গুরুগর্জ্জনে সহরের সৌধমালা কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

মণীশ নিস্পন্দ ভাবে আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া রহিল।

তাহার জীবনের সহিত প্রকৃতির এই লীলার কোন সামঞ্জস্য আছে কি না, সে কি নিবিষ্ট মনে তাহাই চিন্তা করিতেছিল?

বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে যে আর্দ্রতা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার শীতল স্পর্শে মণীশের শ্রান্ত ললাট জুড়াইয়া গেল।

বাদলধারায়—বর্ষা কালেই হউক, অথবা অন্য কোন ঋতুতেই হউক না কেন—একটা অপূর্ব্ব মাদকতা আছে। মেঘ-গর্জ্জন, বিজলী-দীপ্তি এবং বারি-বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই—সঙ্গ-কামনা মানুষকে যেন আকৃষ্ট করিতে থাকে। মন তখন অতীত-বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রাজ্যে নানা অভিনব কল্পনার প্রাসাদ রচনা করিয়া অতৃপ্তকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা পায়।

মণীশের চিত্তেও কি নিভৃত অবসরে এমনই একটা কল্পনা জাগিয়া উঠিতেছিল? ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বর্ত্তমান আশাশূন্য, অতীত তাহার জীবনে আশা আনন্দের সমুজ্জ্বল রেখা টানিতে গিয়া তাহাতে পূর্ণচ্ছেদ দিয়াছে, আর কি তাহা কখনও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? যশঃমান খ্যাতি প্রতিপত্তি—এ সব কিসের জন্য? কি আকর্ষণ—কি প্রলোভন তাহার ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে? কিসের ভাবনা তাহার? ভাবনা?—আছে, আছে এক মস্ত বড় ভাবনা—তাহার স্নেহময়ী জননী!

মণীশ অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হৃদয়ের প্রতিবিন্দু শোণিত দানে যিনি তাহাকে এত বড় করিয়াছেন—ভূতলে তাহার সেই আরাধ্যা জননী—তাঁহার স্নেহের ঋণ কেহ শুধিতে পারে না। মণীশ শুনিয়াছিল, কাশীর মণিকর্ণিকাঘাটে কোন ধনমদগর্ব্বিত ভূম্যধিকারী মায়ের নামে এক

মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছিল,—এতদিনে আমার মাতৃঋণ পরিশোধ হইল! আশ্চর্য্য বিধাতা পুরুষের খেলা—সেই মন্দির তদবধি গঙ্গাগর্ভে বসিয়া যাইতেছে। মাতৃঋণ পরিশোধ্য নহে, তবে তার কিছু প্রতিদান? তাহাও কি সে উপযুক্ত পুত্ররূপে দিতে পারে না? সে কি তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী জননীর মুখে হাসি ফুটাইতে পারে না?

মণীশ আসিয়া আবার আসন গ্রহণ করিল। নাঃ! স্বস্তি তৃপ্তি বুঝি মানুষের কিছুতেই নাই! না হইলে তাহার ত কিছুতেই অভাব নাই, তবে মন তাহার চঞ্চল হয় কেন? যে মনের বাসনা ঐ আকাশের অজস্র ধারার ন্যায় মনাকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কি করিলে উহার নিবৃত্তি হয়? অতীত—অতীত—নির্ম্মম নিষ্ঠুর অতীতের স্মৃতির দহন রাবণের চিতার মত অহোরাত্র তাহাকে দহন করিতে থাকিবে?

মেঘমেদুর আকাশ পানে চাহিয়া মণীশ আত্মবিস্মৃত। সেই সময় তাহার জননী পুত্রের সন্ধানে সেখানে আসিলেন। বৃষ্টিধারা ও বাতাসের শব্দে তাঁহার পদধ্বনি মণীশের শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল না।

কৌতূহল নারীর স্বভাবধর্ম্ম বলিয়া বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্নেহশীলা জননীর অন্তরে পুত্র সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত নাই। আসন্ন সন্ধ্যায় এমন বাদলার দিনে পুত্র নীরবে বসিয়া কি করিতেছে, ইহা জানিবার জন্য মাতৃহৃদয়ের আগ্রহ স্বাভাবিক!

আরাম-কেদারার পশ্চাতে আসিয়া তিনি কিয়ৎকাল পুত্রের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

পুত্র তখনও জননীর আগমন-সংবাদ জানিতে পারে নাই। সে তখন শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের আকাশ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। মেঘ ও দামিনীর বিচিত্র লীলা তাহার রস-পিপাসু আত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

জননী ধীরে ধীরে সন্তানের কেশরাজির উপর দক্ষিণ করতল রক্ষা

করিলেন। চমকিত ভাবে পুত্র ফিরিয়া চাহিতেই মাতার মেঘনম্র আকাশের মত মুখের ছবি দেখিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল। সে সদাপ্রসন্ন মুখে কোনও দিন ত এমন করুণ, কাতর ছায়া সে দেখে নাই। মার কি হইয়াছে?

শিশুর মত সরল ভাবে, জননীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া মণীশ বলিল, "কি হয়েছে, মা? আজ তোমার মুখ এমন কেন?"

সন্তানের উদ্বেগ-বিষণ্ণ কণ্ঠের স্বরে মাতা শ্যামাসুন্দরীর নয়ন আর্দ্র হইয়া উঠিল। মানব-মনের বোধ হয় ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সহানুভূতির একটি সামান্য প্রকাশও যদি স্নেহভাজনের, প্রিয়জনের তরফ হইতে অনুভব করা যায়, তবে সেজন্য সমগ্র অন্তর আন্দোলিত হইয়া উঠে। সন্তানের দিক হইতে আসিলে ত কথাই নাই!

শ্যামাসুন্দরী, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। বোধ হয় প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি আপনাকে সংবরণ করিতেছিলেন। মণীশ তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার অন্ধকারময় জীবনের ধ্রুবতারা। কিন্তু তথাপি পুত্রের নিকট তিনি মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে সম্মত নহেন। তিনি চিরদিন সন্তানকে আদেশ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আবেদন করিতে পারেন নাই। আজ সন্তানের সুখের জন্য তাঁহার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল, পুত্রকে গৃহধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তিনি নিজের তৃপ্তি, সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন, এ কথা নিজের মুখে ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত নহেন। যদি সে তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, তবে সেই প্রত্যাখ্যান,—অস্বীকার-জনিত তীব্র মর্ম্ম-বেদনা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে কয়েকবার বিকাশ প্রভৃতির দ্বারা তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মণীশ নানা অজুহাতে সে প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার অবকাশ দেয় নাই।

এজন্য পুত্রকে গৃহী করিবার প্রস্তাব তিনি স্বয়ং উত্থাপিত করিতে চাহেন না।

বারিধারাসিক্ত অপরাহ্নে একান্ত তন্ময়-চিত্তে সন্তানকে নিষ্ক্রিয় ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শ্যামাসুন্দরীর মনে অতীত যুগের নিজের কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনকে দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করে। প্রকৃতির অঙ্গে যখন মিলনের রূপ বিকশিত হইয়া উঠে—পুরুষ ও প্রকৃতির বিচিত্র লীলার অভিনয় যখন চলিতে থাকে, তখন তরুণ মনে তাহার প্রভাব পড়ে না, ইহা শ্যামাসুন্দরী বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বোধ হয়, কোনও ভাবরসিক মানুষও তাহা বিশ্বাস করিবে না। কারণ, ইহা স্বভাবের একান্ত অনুগত এবং অনতিক্রমনীয়!

মণীশ সন্ন্যাসী নহে। সে তাঁহারই রক্ত-মাংস, মেদমজ্জার অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মাতৃ-হৃদয় এবং জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভাবপ্রবণ মণীশের হৃদয়ে রসধারার নির্ঝর বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু কেন যে সে কঠোর সংযমের পাষাণ-চাপে যৌবনের চঞ্চলতাকে নির্ম্মমভাবে পিষ্ট করিয়া চলিয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত তিনি অনুমান করিতে পারেন নাই। বিকাশ, বন্ধুকে বিবাহে সম্মত করাইবার ভার লইয়াও এ পর্য্যন্ত কেন যে চুপ করিয়া আছে, তাহার কোনও হেতুও তিনি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

অবশ্য শ্যামাসুন্দরীর মাতৃ-হৃদয় মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠাকুল হইয়া বিকাশকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে চাহিত; কিন্তু তাঁহার সারা জীবনের শিক্ষায় তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রশ্ন নিরর্থক। সময় হইলে বিকাশ তাঁহাকে আপনা হইতেই সকল কথাই বলিবে। তিনি নিজে উপযাচক হইয়া প্রশ্ন করিলে মর্য্যাদার হানি না ঘটুক, নিয়ম-নিষ্ঠা এবং আদর্শের গ্লানি ঘটিবার সম্ভাবনা।

চিরন্তনীর জয়

মাতাকে নীরব দেখিয়া তাঁহার স্নেহশীতল বক্ষাশ্রয়ে মাথা রাখিয়া মণীশ বলিল, "কি ভাবছ মা, কি হয়েছে বল্‌লে না ?"

শ্যামাসুন্দরীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা উদ্ভাসিত হইল। তিনি বলিলেন—"পাগল ছেলে, হবে আবার কি ?"

আবদারের স্বরে মণীশ বলিল, "না, মা, বল না—কেন অমন করে আছ ?"

মাতা বলিলেন, "তোকে আমি খুলে বল্‌ব, তবে তুই বুঝবি, বাবা ? আমি ত তোর সুখ দুঃখ মুখ দেখেই বুঝতে পারি।"

মণীশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি যে মা, তাই পার।"

শ্যামাসুন্দরী বলিল, "তোর বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে। আয় আমার সঙ্গে। আজ চিঁড়ে ভাজা বোধ হয় ভাল লাগবে।"

মণীশ বলিল, "ঠিক বলেছ। আজ চিঁড়ে ভাজার জন্য মন কেমন করছিল। তুমি কি করে আমার মনের কথা টের পেলে, মা ?"

মাতা হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন। মণীশ তাঁহার পশ্চাতে চলিল। যে কথাটা প্রকাশের জন্য পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা চাপা পড়িয়া গেল। শ্যামাসুন্দরী চলিতে চলিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বাতাসের শব্দে তাহা অন্যের শ্রুতিগোচর হইবার নহে।

মণীশও বোধ হয় জানিতে পারিল না।

ছয়

"ওগো, শুন্‌ছ ?"

স্বামী তখন আরাম কেদারায় শ্রান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। পত্নীর আহ্বানে তিনি একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "শুন্‌তে ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত। রাণীর কি আদেশ—"

পত্নী তরলিকার সুগৌর আনন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কৃত্রিম রোষভরে বলিল, "তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। যাও, অমন করলে আমি কিছুই বল্‌ব না।"

প্রতুলচন্দ্র পাকা মুন্সেফী পদ পাইয়া মাস কয়েক হইল এই সহরে আসিয়াছেন। তাঁহার যৌবনের কল্পনা, তারুণ্যের স্বপ্ন এখনও নথিপত্রের নীরস ভাষা এবং আইনের জটাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। শান্ত, স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে বাগানের ফুলগাছগুলি দোলাইয়া বাতাস মদির স্বপ্নের আভাস প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

গুড়গড়ার নলটা ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া প্রতুলচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তরুণী পত্নীর পেলব দক্ষিণ করতল চাপিয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই তরলিকা বলিয়া উঠিল, "তোমার যদি লজ্জা-সরম কিছু থাকে। বেয়ারা, চাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

প্রতুলচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তিহীনতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোন অভিযোগ করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া জয়মাল্য লাভের ফলে অনেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রতুলচন্দ্রের সুস্থ, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ যুবকের দেহ, নয়ন বা মনে কোনরূপ পীড়া দেখা দিতে পারে নাই। সুতরাং তিনি সবই দেখিতে পাইতেছিলেন।

তবে যৌবনের ধর্ম্মকে তিনি অবহেলা করিবার চেষ্টা কোনদিন করেন নাই, করিবার কোন প্রয়োজনও তিনি এযাবৎ অনুভব করেন নাই। পাণিপীড়ন করিয়া, অগ্নি সাক্ষী করিয়া যাহাকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া আনিয়াছেন, নিরালায় তাহার কর গ্রহণে কোনও অপরাধ হয়, ইহা তাঁহার আইন শাস্ত্রে লেখা ছিল না। সুতরাং পত্নীকে পাশের আসনে বসাইয়া প্রতুলচন্দ্র হাসিমুখে বলিলেন, "এখন দাস প্রস্তুত, কি আজ্ঞা বলুন ?

তরলিকা স্বামীর এরূপ পরিহাসে অভ্যস্ত ছিল। সে জানিত, এ বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে, অভিনয় ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিবে। সুতরাং সে স্বামীকে আর প্রশ্রয় না দিয়াই বক্তব্য বিষয়ে অবহিত হইল।

পানের ডিবা খুলিয়া স্বামীর মুখে সযত্নরচিত পানের খিলি দিয়া বলিল, "বলছিলুম কি, দাদা আস্‌বেন বলে' পত্র লিখেছেন।"

বিস্ময়ের অভিনয় সহকারে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বটে !"

"না, তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই। সব তাতেই তোমার ঠাট্টা।"

সহসা গম্ভীর হইয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "না, এবার আদৌ ঠাট্টা-তামাসা নয়। হঠাৎ এদিকে তাঁর আসবার হেতু ?"

তরলিকা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা জানি নে। খুলে কিছু লেখেন নি। স্পষ্ট করে কোন কালেই ত দাদা কাকেও কিছু বলেন না।"

প্রতুলচন্দ্র গড়গড়ার নল মুখে আবার তুলিয়া লইয়াছিলেন। নিবিষ্ট মনে কয়েকবার টান দিয়া তিনি বলিলেন, "পরীক্ষা দেওয়ার এমন বাতিক বড়-একটা দেখা যায় না। এবার নিয়ে তিনটে বিষয়ে তিনি এম্-এ পরীক্ষা পাশ করলেন না ?"

তরলিকা বলিল, "ইংরাজী, ইতিহাস, আর সংস্কৃত—তিনটেই ত হল। দেখ না, আবার হয় ত আর একটা বিষয় নিয়ে পড়তে থাকবেন।"

চিরন্তনীর জয়

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "দেখ, তোমার বাবার ঐ একটি মাত্র ত ছেলে। পয়সাকড়িও শ্বশুরমশাই যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু অনিলবাবু বিয়ে করতে এত নারাজ কেন?"

একটি ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তরলিকা বলিল, "কি জানি, দাদার যে কি মতলব কিছুই বোঝা যায় না। ওঁর আরও ক'জন বন্ধু আছেন, তাঁরাও চিরকুমার সভার সভ্য হয়ে আছেন। আমার কিন্তু ভারি বিশ্রী লাগে।"

আরও কয়জন বন্ধু!—কথাটা বলিবার সময় তরলিকার অতীত বাল্য ও কৈশোরের কত দিনের কত কথা মনে পড়িল। সে মনের আনন্দে বেণী দোলাইয়া বনকুরঙ্গীর মত খেলিয়া বেড়াইত, আর তাহার সেই ছুটাছুটি দেখিয়া তাহার দাদার সহিত তাহার বন্ধুরা হাসিয়া আকুল হইত। কখনও কখনও তাহারা বাগানে টেনিস খেলিত, সে তাহাদের খেলার বল লইয়া লুকাইয়া রাখিত—বল লইয়া কত কাড়াকাড়ি চলিত। দাদাদের চায়ের টেবিলে সে-ই ত চা-চিনি যোগান দিত। বিকাশদা ত তাহাকে 'দুষ্টু মেয়ে' বলিয়া না ডাকিলে তৃপ্তি পাইত না। আর মণীদা? শেষাশেষি মণীদা বড় গম্ভীর হইয়াছিল, তাহাকে দেখিলেই অমন করিয়া অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকিত কেন? চারি চক্ষুর মিলন হইলে অপরাধীর মত চক্ষু অবনত করিয়া লইত কেন? বড় লাজুক ছিল মণীদা।

হঠাৎ প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "দাদার বন্ধুদের কথা ভাবতে ভাবতে এ গরীবকে যেন মন থেকে ছুটি দিও না তরু।"

তরলিকা অনুযোগের স্বরে বলিল, "যাও, কি যে বল, হাঁ।"

প্রতুলচন্দ্র মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন, বলিলেন, "বলছি মন্দ নয়, বলি ঐ চিরকুমারদের মধ্যে একটির সঙ্গে যে মশায়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল তা কি জানা আছে মশায়ের?"

তরলিকা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "কি হয়েছিল ?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বিয়ের সম্বন্ধ গো, বিয়ের সম্বন্ধ। তা যার ভাগ্যে যা মাপা থাকে, তাকি আর কেউ তপস্যা করেও পায় ? ভাগ্যে কেঁচে গেছলো সম্বন্ধটা, নইলে এই নাবালক নালায়েকের কি দশা হ'ত বল দিকি ? হাঃ হাঃ !"

সরল বালকের মত উচ্চহাসির রোলে কক্ষ প্রকম্পিত হইল। তরলিকাও হাসিতে হাসিতে তর্জ্জনি হেলন করিয়া বলিল, "দেখ, ও সব ইয়ারকি ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি, ঠাকুরঝিকে ডেকে দোবো ?

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আহা হা, কথাটা বেয়াড়া করে নাও কেন বল দিকি ? যাক্ গে ছাই পাঁশ ও সব দাদার বন্ধুদের কথা, এখন এ বেলা কি রাঁধছো বল দিকি ? আঃ সে দিন যা পোনামাছের রোষ্ট করেছিলে, সত্যি বলছি অমনটি কখনও খাইনি—এখনও যেন মুখে মিলিয়ে রয়েছে। বামুনদের সেই মশলার কাঁড়ি নেই, সেই ঘিয়ের শ্রাদ্ধ নেই,—আঃ তোফা !"

তরলিকার সুন্দর আয়ত নয়ন দুইটি পরম তৃপ্তির হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সময়ে তাহার নয়ন প্রান্ত হইতে যে অপূর্ব্ব প্রীতির জ্যোতিঃ স্বামীর মুখমণ্ডলের উপর বিচ্ছুরিত হইল, সদাপ্রসন্ন ভোলামন প্রতুলচন্দ্রের যদি তাহা দৃষ্টিগোচর হইত—

হঠাৎ প্রতুলচন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমিত বুঝতে পারি না, যারা ভাড়াটে লোকের উপর রান্নাখাওয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, তারা মিথ্যে জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াতে আসে কেন ? দেখ, একটা কথা তোমায় বলেছি বলে মনে হচ্ছে না যেন—"

তরলিকা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আমার কাছে বল নি এমন কথা তোমার পেটের ভিতর থাকতে পারে নাকি মশাই ? সেটি আবার কদ্দিন থেকে হ'ল শুনি ?"

চিরন্তনীর জয়

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আহা হা, বলিই শোন না। অমন করে তাড়া দিলে সব ভুলে মেরে দোবো। জান ত, একেই আমি চোখের সামনে ঐ মুখখানা দেখলে সব কথার খেই হারিয়ে ফেলি?"

তরলিকা প্রেমপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আহাহা, কত খোসামুদী কথাই শিখেছ আদালতে হুজুর হুজুর করে"—

প্রতুলচন্দ্র কৃত্রিম কোপে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "কেঁও,—হামকো পছান্তা নেহি, হাম বাদশা ঔরঙ্গজেব হায়—হাম খোসামোদ করেগা?"—

তরলিকা হাসিয়া লুটাপুটি খাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে বাদশামশাই, এখন কি বলবে বলছিলে বল, সন্ধ্যে হয়ে এল, তোমার সঙ্গে বসে ন্যাকরা করবার সময় আমার নেই!"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ, হা, ভাল কথা, ঐ তোমার দাদার বন্ধু কি মণীবাবু নাকি, ওঁদেরই সম্বন্ধে কথাটা। দেখ, একদিন বিয়ের পর তোমার দাদার সঙ্গে ওদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম। দেখলুম মা আর ছেলে—আর কেউ নেই সংসারে। কিন্তু চমৎকার সাজান গোছান—সব ঝকঝক তক্‌তক্ করছে। হাঁ, আর্টিষ্ট বটে, পছন্দ আছে। আর একটি বন্ধুও ছিলেন, কি তাঁর নামটা বিজন, না—"

তরলিকা বলিল, "ওঃ বিকাশ দা?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, বিকাশবাবুই বটে।

চার জনে এক সঙ্গে খেতে বসলুম, মণিবাবুর মা আমাদের পরিবেষণ করলেন—কি শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, দেখলেই ভক্তি হয়। মণিবাবুর জীবন ধন্য। তার পর যখন তাঁর হাতের এক একখানি ব্যঞ্জন খেতে আরম্ভ করলুম, আহা হা সে যেন অমৃত! এখনও তার স্বাদ ভুলতে পারি নি। মাছের যে স্থক্তো হয় বা কেবল মাখন আর নারকোলের দুধ দিয়ে যে

চিংড়ী মাছ রান্না হয়, তার আগে জানতুম না। দোহাই তোমার, তুমি তেতো ডাল আর চিংড়ী মাছের সুক্তোটা রাধতে শেখো দিকি—"

তরলিকা অভিমানের ভাণ করিয়া বলিল, "কেন, আমাদের হাতের রান্নায় বুঝি অরুচি হয়ে গেছে—"

"ঐত! ঐত! এই যে হাজার বার তোমার রোষ্টের সুখ্যাত করলুম গো। তবে কি জান, ভ্যারাইটি—ঐ গিয়ে মুখ বদলান। ইচ্ছে করে, দিন কতক ঐ মণিবাবুর মার কাছে তোমায় রেখে দি!"

তরলিকা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "তাই নাকি। ওরে আমার রসিক রে!"

ঠিক সেই সময়ে বাহিরের বারান্দা হইতে আলোকরশ্মি কক্ষ মধ্যে নিপতিত হইল।

সন্ধ্যার ছায়া তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। ভৃত্য আলোক লইয়া আসিতেই তরলিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে তখন স্বামীর ঐ কথাটাই জাগিতেছিল,—দিন কতক মণিবাবুর মার কাছে তোমায় রেখে দি। এ কি বিশ্রী কথা!

তাহার সদা প্রফুল্ল মন চিন্তাভারগ্রস্ত হইল—স্বামীর এ কথার অর্থ কি? যাঁহার মন সরল নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় নির্ম্মল, যাঁহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তাহার নিকট স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত চিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট, তাঁহার মনের নিভৃত নিবাসে এমন কি অজানা অচেনা জিনিষ লুক্কায়িত থাকিতে পারে, যাহার দেখা সে চেষ্টা করিয়াও পাইতে পারে নাই!

বিবাহের সম্বন্ধ? বি—বা—হ! তাহাতো সে কিছুই শুনে নাই। এমন সম্বন্ধ ত আরও আসিয়াছিল। কিন্তু সে জন্য এ কথা তুলিবার প্রয়োজন কি ছিল? উহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ?—দূর দূর—এও াকি একটা কথা! দূর ছাই!

হঠাৎ তাহার মোহস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, কি জানি কেন সে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল।

প্রতুলচন্দ্রও নিবিষ্ট মনে কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। তিনিও আরাম কেদারায় সোজা হইয়া বসিলেন।

হঠাৎ বাগানের ফটকের কাছে পদশব্দ শুনিয়াই তরলিকা স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

পরিচিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "মুন্‌সেফবাবু আছেন না কি?"

প্রতুলচন্দ্র কেদারা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আসুন, বীরেশবাবু।"

বীরেশবাবু স্থানীয় কলেজের বিচক্ষণ অধ্যাপক। বয়সে প্রবীণ এবং জ্ঞানে বিজ্ঞ। এই তরুণ-বয়স্ক মুন্‌সেফটির বিনয়-নম্র ব্যবহার, পাণ্ডিত্য এবং শিষ্টাচারে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বয়সের পার্থক্য উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ বীরেশবাবুও কায়স্থ বলিয়া উভয়ের মধ্যে অল্পদিনের পরিচয়েও আন্তরিক আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অধ্যাপককে সমাদরে বসাইয়া প্রতুলচন্দ্র ভৃত্যকে তামাক সাজিবার আদেশ দিলেন।

বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্দ্ধক্যের পরিমাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত হইয়া থাকে। মানব-মনের সুস্পষ্ট পরিচয় যাঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই সকল তত্ত্বদর্শী মনীষী বলিয়া থাকেন, তারুণ্য বা বার্দ্ধক্য মানুষের দেহে নহে, মনে। সুতরাং ২৮ বৎসরের যুবা প্রতুল-চন্দ্রের সহিত পঞ্চাশৎ বর্ষীয় প্রৌঢ় বীরেশবাবুর মনের একতানতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট কোন কারণ ছিল না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সঙ্গে উভয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল

দর্শনশাস্ত্রে উভয়েই পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলেজে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিলেও, দর্শনে বীরেশবাবুর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বীরেশবাবুর প্রথম যৌবনে যে সকল সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙ্গালীর নিকট তাহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। কেহ বা সে সমস্যার সমাধান করিয়া একটা পথ বাছিয়া লয়, অনেকে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়াই চলে।

বীরেশবাবু সমস্যার সমাধান পাইয়া আত্মস্থ হইয়াছিলেন। প্রতুলচন্দ্রের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার মতের ও চিন্তাধারার বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল। বীরেশবাবু প্রগতি বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু যে দেশে তাঁহার জন্ম, যে ভাবধারায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছেন, দেশের যে অবদান, মাটীর রস, বায়ুর স্নিগ্ধতা, শ্যামা মায়ের বুকের অফুরন্ত স্নেহনির্ঝরের শীকরকণায় মিশিয়া মানুষকে সঞ্জীবিত রাখে, তাহার মহিমা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন—বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং প্রতীচ্য শিক্ষার মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিতে পারে নাই।

প্রতুলচন্দ্র তরুণ হইয়াও এই মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তিনি সকল সময়েই মনে করিতেন, তিনি হিন্দু, তিনি বাঙ্গালী। য়ুরোপীয় সভ্যতার সমুজ্জ্বল দীপ্তি মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত, সচকিত করিয়া তুলে; কিন্তু তাহার অন্তরাল হইতে বস্তুতান্ত্রিকতার যে ক্ষুধিত, লুব্ধ রূপ দেখা যায়, তাহা প্রতীচ্য মনোবৃত্তির স্পৃহনীয় নহে।

গড়গড়ার নল তুলিয়া লইয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "আমাদের কলেজে একজন নূতন অধ্যাপক আসছেন, তাঁর জন্য একটা বাসা ঠিক করা হয়েছে। আপনার বাংলো থেকে বেশী দূরে নয়।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এখানে এসে অবধি একদিনও কলেজটা দেখ্‌তে

যাওয়া হয় নি। যে কাজের ভিড়। আপনি ছাড়া অন্য কোন অধ্যাপকের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয় নি। একদিন যাব কলেজে।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "আপনি পণ্ডিত মানুষ। পল্লী সহরের কলেজ কেমন চল্‌ছে, আপনাদের জানা দরকার।"

প্রতুলচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "না, সত্যি, আমি এজন্য লজ্জিত। সোমবার কোর্টে যাবার আগে একবার দেখে আস্‌ব। ভাল কথা, আপনি যে নূতন অধ্যাপককে আমার প্রতিবেশী করে দিচ্ছেন, তাঁর নামটা কি বলুন ত?"

জোরে গড়গড়ায় একটা টান দিয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "অনিলচন্দ্র বসু। তিন বিষয়ে এম্‌-এ।"

প্রতুলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব দৃষ্টিতে বীরেশবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার শ্যালক অনিলচন্দ্র এখানে অধ্যাপক হইয়া আসিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহাকে বা স্বীয় সহোদরাকেও তিনি জানাইলেন না কেন? এ মন্ত্রগুপ্তির সার্থকতা কি?

তিনি জানিতেন, পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অনিলচন্দ্র ভারতীয় সিবিল্‌সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। পরীক্ষায় সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অনিলচন্দ্র চাকুরীতে যোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও অনুরোধ-উপরোধে কর্ণপাত না করিয়া তিনি সে আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। পরের কাছে দাসত্ব করাকে তিনি উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোথাও কোন প্রকার কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন নাই। তবে আজ এতদূরে—পল্লী সহরে অধ্যাপনা-কার্য্য গ্রহণের মনস্তত্ত্ব কি? দাসত্ব হইলেও অধ্যাপনা মহৎকার্য্য, লোক-শিক্ষার পীঠস্থান। সহরের কলেজটি সাধারণের অর্থে স্থাপিত—

বেসরকারী। সেই জন্যই কি এতদিন পরে অনিলচন্দ্র এ কার্য্য গ্রহণ করিলেন ?

প্রতুলচন্দ্রের মুখে চিন্তার রেখা দেখিয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "কি ভাব্ছেন আপনি ?"

নবীন মুন্‌সেফ অকারণ মিথ্যাভাষণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "অনিলবাবুর এই মনোবৃত্তির মূলতত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছি না। সিবিল সার্ব্বিসের লোভনীয় এবং প্রার্থনীয় পদ পেয়েও যিনি তা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারলেন, তিনি কলেজের অধ্যাপনার ভার সামান্য অর্থের বিনিময়ে কেন গ্রহণ করলেন, বুঝতে পাচ্ছি না।"

বীরেশবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি তাঁকে চেনেন না কি ?"

মৃদু হাসিয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনি আমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়, —আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর।"

অধ্যাপক বীরেশবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিবার পর বলিলেন, "সিবিল সার্ব্বিসের পদ অনিলবাবু পেয়েছিলেন না কি ?"

"হ্যাঁ, ভারতে যে পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু কাজ পেয়েও অনায়াসে তা তিনি উপেক্ষা করেছেন।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আরও বিস্ময়ের বিষয়, এখানে তিনি আস্ছেন, তাও আপনাদের জানান নি।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আসবার সংবাদ অবশ্য জানিয়েছেন ; কিন্তু কি জন্য আসছেন, তা লেখেন নি।"

বড় অদ্ভুত লোক ত !—

বীরেশবাবু নীরবে ধূম পান করিতে লাগিলেন।

...ARY PUBLIC ...

সাত

"দাদা, এ তোমার ভারী অন্যায়"—

"কেন, কি হয়েছে, করলুম কি ?"

তরলিকা অভিমান-স্ফুরিতাধরে বলিল, "তুমি এখানে চাকরী নিয়ে এসেছ, অথচ অন্য বাড়ী ভাড়া নিলে—একবার আমাদের জানাবার দরকারও হ'ল না ? আমরা কি এতই পর ?"

অনিলচন্দ্র সহোদরার এই অভিমান দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তোর ছেলেবেলার স্বভাবটি এখনও ঠিক এক রকমই আছে,—অল্পেই অভিমান। মনে পড়ে, একদিন ঠিক দুপুর রোদে আমাদের সঙ্গে বাগানে ছুটোছুটি ? মণী তোকে পেয়ারা পেড়ে দিচ্ছিল আর তুই ছুটে ছুটে কুড়িয়ে আনছিলি—বাবা তাই তোকে খুব বকলেন"—

"তা যাই বল দাদা, তুমি যদি আমাদের পর মনে না করতে, তা হলে নিশ্চয় আমাদের কাছে সব খুলে লিখ্‌তে, আমাদের বাড়ীতেই আস্‌তে, আলাদা বাসা করতে না।"

অনিলচন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তৃপ্তির একটি দীর্ঘ শ্বাস নির্গত হইল। অপাপবিদ্ধ বালিকার কোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয় চিরদিন এমনই থাকে! বাল্যের মধুর পাপ-লেশহীন সরল প্রাণ-খোলা হাসিকান্না খেলাধূলা কোন্ মায়াবীর, দণ্ড মায়াসম্পর্শে পরিণত বয়সে অন্তর্হিত হয় ?

প্রফুল্লচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনীর আলোচনা

শুনিতেছিলেন। এবার তিনি বলিলেন, "আপনার বোনের এ নালিশ কি সত্য নয়, অনিলবাবু?"

তেমনই প্রশান্তভাবে হাসিতে হাসিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "না, প্রতুলবাবু। যদি দু'দিনের জন্য বেড়াতে আস্তুম, তা হলে আমার বোনের বাড়ী ছাড়া আমি আর কোথাও নিশ্চয় যেতুম না। কিন্তু আমাকে স্থায়িভাবে কলেজে পড়াতে হবে। এ অবস্থায় আপনাদের বাসার কাছাকাছি অলাদা থাকা কি ঠিক নয়? বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর যে একান্তরূপে ভক্ত, তার কি একজন সরকারী চাকুরের বাড়ীতে স্থায়িভাবে থাকা ঠিক? আপনিই বিচার করে বলুন, প্রতুলবাবু।"

পতি ও পত্নীর দৃষ্টি একযোগে অনিলচন্দ্রের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। এতক্ষণ কেহই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন নাই। প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার শ্যালকের অঙ্গে আগাগোড়া মোটা খদ্দরের সাধারণ বেশভূষা, পায়ে সামান্য মূল্যের জুতা। তরলিকা লক্ষ্য করিল, দাদার মস্তকে ঈষদ্দীর্ঘ, কুঞ্চিত কেশরাজির শোভা আর নাই। সমগ্র দেহে ও ব্যবহারে বিলাসিতার পূর্ব্বচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া, একটা সংযমপূত অপূর্ব্ব দীপ্তি অনিলচন্দ্রের আননে নয়নে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠের —একমাত্র সহোদরের এই পরিবর্ত্তনে তরলিকার মনে কোন্ ভাবের উদ্ভব হইল, তাহার দৃষ্টিতে বা কথায় তাহার স্বরূপ ব্যক্ত হইল না। সে মৃদুস্বরে বলিল, "এ সব খদ্দর কিনেছ?"

অনিলচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না বোন্। রোজ আমি চার ঘণ্টা করে চরকা চালাই। তাতেই আমার জামা, কাপড়, চাদর, বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর সব হয়ে যায়।"

"এখানেও চরকা চালাবে, দাদা?"

"নিশ্চয়। ওটা যে নিত্য কর্ম্মের মধ্যে বোন্।"

তার পর ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি হাকিম মানুষ। আমার চরকা, তাঁত, মাকু—এ সব হাঙ্গামা নিয়ে কি এখানে থাকা উচিত? আপনিই বলুন, প্রতুলবাবু?"

প্রতুলচন্দ্র নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তার পর বলিলেন, "তোমার দাদার জন্যে চা নিয়ে এস, আর পার ত আমার জন্যও আর এক কাপ—"

অনিলচন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "আমি চা ত খাই না—তরু, আমার জন্য দরকার নেই।"

তরলিকা সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি চা আবার কবে ছাড়্লে? দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার চা নইলে যে চল্‌ত না তোমার! তোমার বন্ধুরা ত—"

জ্যেষ্ঠ হাসিয়া বলিল, "তুই ত অনেক দিন আমাদের ওদিকে যাস্ নি, তা জান্‌বি কি করে? এখন চা আর ভাল লাগে না। তবে সর্দ্দি কাশি হলে মাঝে মাঝে এক আধ কাপ্ চলে। বন্ধুদের কথা বলতে পারি নি। মণীশ ত—"

তরলিকা তাড়াতাড়ি বলিল, "বেশ, চা না খাও, সরবতে ত আপত্তি হবে না। তুমি বস, আমি এখনি আস্‌ছি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে লঘুগতিতে চলিয়া গেল।

প্রতুলচন্দ্র নিবিষ্ট মনে কি ভাবিতেছিলেন। পত্নী চলিয়া গেলে তিনি শ্যালকের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি, অনিলবাবু? এখানে সামান্য বেতনের অধ্যাপকের কাজ নিয়ে এলেন, আপনার বাবা তাতে মত দিয়েছেন?"

অনিলচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বাবার মতের বিরুদ্ধে এ জীবনে কোন

কাজ করি নি। প্রথমে তিনি আমার উদ্দেশ্যের ধারা বুঝতে পারেন নি, তাই হয় ত একটু দুঃখিত হয়েছিলেন; কিন্তু এখন তিনি আমার কোন কাজে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বিশেষভাবে উৎসাহই দিয়ে থাকেন। বাবা বছরখানেক হ'ল ওকালতীর কাজও ছেড়ে দিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, বয়স হচ্ছে, উৎসাহ নেই।"

প্রতুলচন্দ্র হঠাৎ সে কথাটি চাপা দিয়া বলিলেন, "বেশ যা হোক আপনি—এখানে ত ভাগবতের কথা শোনাতে আসেন নি যে, কেবল বুড়োদের কথাই চলতে থাকবে—বলুন আপনার নিজের খবর—"

অনিলচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "নিজের আবার খবর কি?—মস্ত বড় মানুষ—তার আবার খবর!"

প্রতুলচন্দ্র মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে খবর নয় মশাই, সে খবর নয়। খবর কি আর কিছু থাকতে পারে না?" তাহার পর নয়নে অপরূপ কটাক্ষ ভঙ্গীর অভিনয় করিয়া বলিলেন, "বলছিলাম কি, গেরুয়া রুদ্রাক্ষি গ্রহণ করে কবে মশায়ের গুটি গুটি শ্রীবৃন্দাবনধামের অভিমুখে রওনা হওয়ার দিন স্থির হয়েছে?"

অনিলচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে কি আরও সোজা করে না বুঝিয়ে দিলে শ্রীল শ্রীযুক্ত সিভিলিয়ন মিঃ এ, বাসু এম, এ, আই, সি, এস মশাই সেটা কি বুঝতে কষ্ট অনুভব করছেন?"

"বাস্তবিক—"

"থাক্, আর বাস্তবিকে কাজ নেই, সোজা কথায় মশাই কি এই বয়সে সংসারধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে যৌবনে যোগিনী সেজে থাকবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন? তার কারণটা কি এ অর্ব্বাচীন অধীনরা শুনতে পায় না একটু?"

চিরন্তনীর জয়

অনিলচন্দ্রের প্রশান্ত মুখমণ্ডল চিন্তারেখাগ্রস্ত হইল। অসম্ভব গাম্ভীর্য্যে ভরা কণ্ঠে সে বলিল, "দেখুন প্রতুলবাবু, মানুষের জীবনটা যে কেবল বিবাহ নিয়েই কাটাতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই। কত লোক জ্ঞান আহরণ করছে, কেউ বা নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে, আবার কেউ কেউ লোকের সেবায় আত্ম উৎসর্গ করছে—"

"ব্র্যাভো! ব্র্যাভো! থ্রি চিয়ার্স ফর মিঃ এ, ভাস্থ এম, এ, আই সি, এস! তা মিঃ ভাস্থর বন্ধু দুটিও কি ঐরূপ মহৎ ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করেছেন? না, তাঁরা ঘর সংসারে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করেছেন?"

"ঠাট্টা আপনি যত ইচ্ছা করতে পারেন, কিন্তু জেনে রাখবেন, এ সঙ্কল্প আমার টলবে না। আপনারা গভর্ণমেণ্টের অফিসার, আপনারা ত দেশের দীন দরিদ্রের খোঁজ খবর রাখেন না—"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি আমি নিজে। তা মশায়ের বন্ধু দুটিও কি দেশের দীন দরিদ্রদের তত্ত্বতাবাস করেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, না আর কিছু করছেন?"

"কে, মণীশ আর তার বন্ধু বিকাশ? বিকাশ কি করবে বলতে পারিনি, কিন্তু মণীশ? ওঃ তার মত ছেলে ত দেখিনি আমি। সে যে আইডিয়্যাল নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে, তারই নিত্য পূজো করছে আর বোধ হয় তাই নিয়েই তার শেষ নিশ্বাস বার হয়ে যাবে। এর জন্যে তার ত্যাগ স্বীকার অসাধারণ!"

"কি রকম, দো'ফলা দধীচি না কি? না হাওয়ার্ড দি ফিল্যান্-থ্রপিষ্ট?—"

এবার অনিলচন্দ্র ঈষৎ তপ্ত স্বরে বলিল, "দেখুন, যার বিষয়ে কিছু জানেন না, তাকে নিয়ে তার অসাক্ষাতে এরকম—"

প্রতুলচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবার মত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "একসকিউজ মিঃ অনিলবাবু, আমার কথাগুলো অন্যায়ই হয়েছে বটে। কিন্তু আমি আপনার বন্ধুদের সম্বন্ধে কোন ভাল কি মন্দ ধারণা নিয়ে যে কথা গুলো বলেছি, তা মোটেই না। আমি ত আপনাকেও বাদ দিই নি। তবেই মনে করুন, আমার কথার মধ্যে কোন দ্বেষবিদ্বেষের নাম গন্ধও ছিল না। যাক্, মোটের উপর জানতে চেয়েছিলাম, আপনারা তিন জনে কি পরামর্শ করে চিরকুমার সভার মেম্বার হয়েছেন, না এটা একটা খেয়াল আপনাদের ?"

অনিলচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "দেখুন, এসব কথা নিয়ে আমি আলোচনা করতে ভাল বাসি না। তবে এটা জেনে রাখুন যে, খেয়াল আমাদের মোটেই নেই এতে, অন্ততঃ আমার ত নয়ই। আগেই ত বলেছি, জগতে এমন তর ঢের হয়। কেউ থাকে একটা আইডিয়্যাল নিয়ে, কেউ বা একটা স্মৃতির পূজো করে—"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ঠিক কথা। তা আমি ত আপনাদের আইডিয়্যালের কোন অমর্য্যাদা করছিনে। তবে কি জানেন, শুনেছিলাম, আপনার ভগ্নীর সঙ্গে মণীশবাবুর—"

অনিলচন্দ্রের মুখ চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, সে প্রতুলচন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "থাক ও সব কথা। আগেই ত বলেছি, এ ভাবের কথার আলোচনা আমার মোটেই ভাল লাগে না। এখন আপনি বলুন, এখানকার হাল চাল কি ? এখানে—"

বাহিরে ফটকের কাছে বীরেশবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "মুনসেফবাবু, বাড়ী আছেন ত ?"

সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের পদধ্বনি নিকটতর হইয়া আসিল।

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "অনিলবাবু, আপনি যে কলেজের কাজে যোগ

দিয়েছেন, বীরেশবাবু সেখানে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। এখনও বোধ হয় পরস্পরের মধ্যে আলাপ হয় নি?"

অনিল বলিল, "না, আমি ত সবে এসে পৌঁছেছি। কাল কলেজ খুল্‌লে দেখা হবে। তবে প্রিন্সিপ্যালের ভাই আমাকে ষ্টীমার-ঘাট থেকে নিয়ে এসেছেন।"

বীরেশবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই প্রতুলবাবু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। শ্যালককে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনিই অনিল-বাবু, আজ ভোরেই এসেছেন। আর ইনি কলেজের মেরুদণ্ড বীরেশ-বাবু।"

বীরেশবাবু এই প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকের দিকে চাহিয়া অভিবাদন করিতেই অনিলচন্দ্র প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। আমাকে কোন রকমে চালিয়ে নেবেন। অভিজ্ঞতা কিছুই নেই।"

বীরেশবাবু মুগ্ধ হইলেন। তরুণ-বয়স্ক উচ্চশিক্ষিতদিগের মধ্যে এমন বিনয় ইদানীং বড়-একটা তিনি দেখিতে পান না।

তরুণ বৈশাখের প্রভাতে অরুণের দীপ্তি তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই। বাংলোর সম্মুখে বৃক্ষবিথীর মধ্য দিয়া কঙ্কররচিত মনোরম পথটি চলিয়া গিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া অনিলচন্দ্র বলিয়া উঠিল, "পল্লীর এমন মধুর শ্রী পল্লী সহরে কদাচিৎ দেখা যায়, প্রতুলবাবু। আপনারা এখানে বেশ আছেন।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "সে কথাটা মিথ্যা নয়, অনিলবাবু। বড় বড় সহরের অনেক কদর্য্যতা, নানা রকমের বিশ্রী আবহাওয়া এখানে দেখ্‌তে পাবেন না। পল্লীর শান্ত শ্রীর মাধুর্য্য এখানে অপর্য্যাপ্ত পাবেন।

ভৃত্য ও পাচক তিনখানা পাত্র লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখের টেবলের উপর উহা রক্ষা করিয়া তাহারা নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তার পর তিন গ্লাস সরবৎ ও তিন গ্লাস পানীয় জল একে একে উপস্থিত হইল।

বীরেশবাবু বলিলেন, "সকালবেলা এসব কি, মুন্‌সেফ্‌বাবু?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "হিন্দু গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বাঙ্গালার মেয়েরা এখনও ভোলে নি। এ সব আমার অধিকার-সীমার বাইরের ব্যাপার, বীরেশবাবু।"

প্রবীণ অধ্যাপক অনিলচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার কি মত, তা জানি না; কিন্তু লেখাপড়া শিখে—পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে, বাঙ্গালার সনাতন ভাবধারা কলকাতার অনেক হিন্দু পরিবার ভুলে গেছেন। এটা কি খুব লোকসান বলে মনে করেন না?"

অনিলচন্দ্র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অনেক দৃশ্যের স্মৃতি যেন ছায়াচিত্রের মত চলিয়া গেল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদের লোকসান কতখানি হয়েছে, তার হিসাব নিকাশ করে দেখ্‌বার প্রবৃত্তি অনেকের মধ্যেই এখনও জেগে ওঠে নি, এ কথাটা আমি জোর করেই বল্‌তে পারি।"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা চলে যাচ্ছে, তার জন্যে আপশোষ বা হাহুতাশ করে ত কোন ফল নেই।"

অনিল বলিল, "তার মানে?"

প্রতুল বলিলেন, "মানে এই যে, কাল তার কায করে চলে যাবেই, তাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না, তার গতিতে বাধা দিতে পারবে না। তুমিও না, আমিও না।"

বীরেশবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "না প্রতুলবাবু, এখানে একটু বলবার

আছে আমার। কাল তার কায করে চলে যাবে এটা ঠিক, কিন্তু তা বলে আমাদের অতীতটাকে সে যে একেবারে পায়ে দলে চলে যাবে, আর আমরা তার খুদকুঁড়োটুকুও ধরে রাখবার চেষ্টা কোরবো না, এমন'ত কোন লেখাপড়া নেই।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "না, তা নেই। কিন্তু যারা ঐ রকম করে মরা অতীতটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে গেছে, তারাই মরা জাত হয়েছে। এই ধরুন না, রোমানরা, গ্রীকরা; ব্যাবিলোনীয়ান ইজিপসিয়ানদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "এটা ঠিক উল্‌টো হচ্ছে প্রতুলবাবু। রোমান গ্রীকরা একেবারে পুরোনো খোলোস ছেড়ে নতুন সাজতে চেয়েছিলো, তাই আর পুরোনো গ্রীক রোমান রইলো না, নতুন ইটালিয়ান গ্রীক জাত তৈরী হোলো। কাজেই আগেকার সেই অসাধারণ গ্রীক বা রোমান জাত আর রইলো না—তাদের অতীতের গৌরব ঐ খোলোসের সঙ্গে সঙ্গেই পুড়িয়ে ফেলা হোলো।"

অনিল বলিল, "আর হিন্দুদের আর্য্যসভ্যতা এখনও তাদের সাহিত্য সমাজ ধর্ম্ম ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে যেমনই, তেমনই রোজকার আচার ব্যবহার আহ্নিক পূজোর মধ্যে দিয়ে সমাজ বজায় রয়েছে, তাই পুরোনো হিন্দুরা এখনও বেঁচে রয়েছে, চিরকাল থাকবে।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "তা ঠিক। জগতে এক হিন্দুরা ছাড়া কেউ বলতে পারে না যে, তাদের রামায়ণ মহাভারতের মত পুরোনো শিক্ষা দীক্ষা এখনও তাদের মধ্যে সজীব হয়ে রয়েছে।"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সজীব? হাঁ, কাগজে কলমে বটে, হাতে হাতিয়ারে নয়!"

অনিল বলিল, "নয়? কে বল্‌লে নয়? দুচারটে লোক যা

ইচ্ছে তাই করছে ব'লে? তেমনই লক্ষ লক্ষ হিন্দু ঠিক হিন্দুই আছে।"

তর্ক ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

রবিবারের অবকাশ। কাহারও তাড়া ছিল না। সুতরাং জলযোগের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতে লাগিল।

বীরেশবাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, এই উচ্চশিক্ষিত তরুণ যুবক বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়ার মধ্যেও একটা সুস্থ, সবল বিচারসঙ্গত মনোবৃত্তির অধিকারী। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুর ভাবরাজ্য ও কর্ম্মজগতের অনেক সংবাদ ইহার নখদর্পণে বিদ্যমান। প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব ইহাকে অভিভূত ও বিচলিত করিতে পারে নাই।

এই তত্ত্বটুকু অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই নবপরিচিত অধ্যাপকের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিজ্ঞানের বিচিত্র রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। প্রাচীন হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির সন্ধান পাইয়া যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবগুলিকে তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাই অনুরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন যুবকের প্রতি তাঁহার প্রৌঢ় মন আকৃষ্ট হইল।

অনিলচন্দ্র অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল, বীরেশবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধী বড় চমৎকার ছেলে। এমন একটি রত্ন হঠাৎ পাওয়া যায় না। ওঁর বিবাহ হয়েছে?"

প্রতুল হাসিয়া বলিলেন, "ঐখানেই গোল। উনি কিছুতেই বিবাহে রাজী নন। অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল; কিন্তু এই তরুণ যোগী এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য।"

সবিস্ময়ে বীরেশবাবু বলিলেন, "কেন বলুন ত?"

"কারণ কিছুই প্রকাশ নেই। তবে পূর্ব্বরাগ বা অনুরাগের কোন বালাই এতে নেই। শুধু খেয়াল। ওঁর দলের সব ক'টিই এই মন্ত্রের উপাসক শুনেছি।"

বীরেশবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আট

নদীর জলে উষাস্নান সমাপ্ত করিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখনও দিক্‌চক্রবালে অরুণ-লেখার দিব্য প্রকাশ দেখা দেয় নাই। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর যখন তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রভাত-কিরণে প্রকৃতির শ্যামল শ্রী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বীরেশবাবু গুণ গুণ রবে তখনও একটা ভজন গাহিতেছিলেন। অন্তঃপুরের সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, প্রতিদিনের ন্যায় তাঁহার তরুণী কন্যা পুষ্প চয়নে সমাহিত-চিত্ত। প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চ গোময়লিপ্ত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

পিতার নয়নের স্নেহদৃষ্টি কন্যার নিষ্ঠাভরা পুষ্পচয়ন দেখিতে লাগিল।

প্রাতঃস্নান সারিয়া গৃহিণী হৈমবতী রন্ধনাগারের দিকে যাইতেছিলেন। স্বামীর নিস্পন্দ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কন্যার প্রতি এমনভাবে চাহিয়া থাকিতে তিনি স্বামীকে কোন দিন দেখেন নাই। তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে আজ যেন একটা গম্ভীর ছায়া—চিন্তার রেখাবলী ললাট-দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্বামীর মন ও চিন্তাধারার সহিত হৈমবতী এতই সুপরিচিত ছিলেন যে, আজিকার এই ভাব-বৈচিত্র্য তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিল।

গতিবেগ হ্রাস করিয়া তিনি স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরেশচন্দ্র এমনই আপন-ভোলা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন যে, পত্নীর আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার অগোচরই রহিয়া গেল।

চিরন্তনীর জয়

হৈমবতী ধীরে ধীরে স্বামীর স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিতেই বীরেশচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল।

হৈমবতী বলিলেন, "অমন করে কি ভাব্‌ছিলে, এই সকাল বেলা?"

পত্নীর অতর্কিত প্রশ্নে বীরেশচন্দ্রের বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "মা আমার সত্যি বড় হয়ে উঠেছে। এ গৌরীর যোগ্য বর কোথায় পাব তাই ভাবছি।"

হৈমবতীর মাতৃহৃদয় এই একমাত্র সন্তানের জন্য কতখানি উদ্বেগাকুল থাকিত, ক্রমবর্দ্ধমানা, যৌবন-পুষ্পিতা কন্যাকে শীঘ্র পাত্রস্থ করিবার দুর্ভাবনায় অধীর হইয়া উঠিত, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু স্বামীকে এতদিন তিনি এ বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিতে পারেন নাই। প্রশ্ন তুলিলেই বীরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিতেন, "ব্যস্ত কি? মেয়ে ত আমার এখনও তেমন বড় হয়নি।"

কন্যার নাম গৌরী হইলেও তাহার গাত্রবর্ণ নাম-মাহাত্ম্যের অনুরূপ ছিল না। কিন্তু কবিবর্ণিত "ম্লান ছল ছল" দেহকান্তিতে একটা বিচিত্র মাধুর্য্য ছিল। গৌরীর মুখশ্রীতে একটা পবিত্র স্নিগ্ধ দীপ্তি, নয়ন যুগলে করুণার প্রস্রবণ যেন নিয়তই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

বীরেশচন্দ্র কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।" কিন্তু দেশের আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ বা বিশ্বাস ছিল না। সারাজীবন ধরিয়া শিক্ষা-বিভাগের সেবা করিলেও তিনি উত্তমরূপে জানিতেন, এ শিক্ষার ফল বাঙ্গালীর পক্ষে অমৃত-তুল্য হইয়া উঠিতে পারে না। তাই তিনি কোনও দিন কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান নাই। কলেজে অধ্যাপনার অবকাশে প্রত্যহ দুই বেলা তিনি স্বয়ং গৌরীর লেখা পড়ার তত্ত্বাবধান ও সহায়তা

করিতেন। ইংরাজী ভাষা, ভাষা হিসাবে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া কন্যাকে তিনি অবশ্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতেন, কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই দুইটি ভাষার প্রতিই তিনি সমধিক জোর দিয়া কন্যার চরিত্র ও মনকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, প্রাচ্য মনোভাব ও শিক্ষাদীক্ষাকে প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে হইলে প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালীকে স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইলে অবাঙ্গালী শিক্ষা ও মনোবৃত্তির গতিরোধ অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

তাই রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি, বঙ্কিম, মাইকেল, নবীন, হেম, রবি, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রভৃতির পাশে পাশে, শেলী, কীটস্, টেনিসন, সেক্সপীয়ার, ডিকেন্স, টলষ্টয়, হুগোর মোটামুটী পরিচয় ঘটিবার ব্যবস্থা কন্যার সম্বন্ধে করিয়াছিলেন। এই অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণীর মনোরাজ্যে জ্ঞানের প্রবাহধারায় ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার ব্যঞ্জনার তরঙ্গমালা যাহাতে নিয়ত সমুচ্ছ্বসিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থায় পিতার অখণ্ড মনোযোগ ছিল।

আজ মধুর প্রভাতে, রবির প্রথম কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল উদ্যান মধ্যে "সঞ্চারিণী পল্লবিনী" লতার ন্যায় কন্যার লীলায়িত গতিভঙ্গী দেখিয়া পিতৃহৃদয়ে যে অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর কয়টি কথায় মাতার অন্তরেও তাহা সুস্পষ্ট জাগিয়া উঠিল।

হৈমবতী একটি মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি এতদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছ—তোমরা পুরুষ মানুষ সব কথা বুঝতে চাও না; কিন্তু রাতে আমার সত্যি ঘুম হয় না। বয়স চলে গেলে তখন বিয়ে দিয়ে কি লাভ তা বুঝতে পারি নে।"

চিরন্তনীর জয়

কথাটা বীরেশবাবুর অন্তরে সত্যই আজ প্রচণ্ড আন্দোলন তুলিল। মানুষের মন একটা অবলম্বনকে আশ্রয় করিতে না পারিলে অবিচলিত থাকিতে পারে না। তবু বহুমুখী পুরুষের চিত্তে নানা বৈচিত্র্য, আশ্রয়ের রূপান্তর হিসাবে দেখা দেওয়া সম্ভবপর; কিন্তু নারীর মন বহু বিষয়ে একনিষ্ঠতা অবলম্বন করে না, ইহা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। যৌবন যখন দেহ ও মনে তাহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করে, তখন নারীর পক্ষে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। আশ্রয়-তরুকে বেষ্টন করিয়া লতা আপন গৌরব ও বৈভবে যখন পুষ্ট ও মুকুলিত হইতে থাকে, তখনই লতার জীবনের সার্থকতা ঘটে। এ সত্যকে কোনও বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

না,—পিতা হইয়া প্রতীচ্য মোহের প্রাবল্যে তিনি কন্যার বিবাহে অধিক বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। নিজ জীবনের যৌবনের অভিজ্ঞতা পুরুষ হইয়াও যদি তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এত বিলম্ব করিতেন না।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চেষ্টা কি তিনি করেন নাই? কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উপলক্ষে তিনি ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যে পাত্রগুলি তাঁহার কাছে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাদের তরফ হইতে একে একে অনেকেই গৌরীকে দেখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কাহারও মনে ধরে নাই। সকলেই সুগৌরী পাত্রীর সন্ধানে ব্যস্ত। শ্যামা বঙ্গভূমির ক্রোড়ে গৌরীর আবির্ভাব যে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে, এ যুগের নকল সভ্যতার আলোক-মুগ্ধ বিমূঢ়গণ তাহা বুঝিতে চাহে না। নিজেদের শরীরের দিকে চাহিয়াও তাহারা আপনাদের ভ্রম নিরাকরণ করিবার চেষ্টাও করে না!

বীরেশ বাবু পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "না, এবার আর মোটেই

সময় নষ্ট করবো না। যেমন করে হোক আমার মা জননীকে সুপাত্রে দেবার ব্যবস্থা করছি। এখন তাঁরই ইচ্ছা!”

যুক্ত কর ললাটে লগ্ন করিয়া প্রৌঢ় অধ্যাপক কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হৈমবতী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “চল, এ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না, গৌরীমা এদিকেই আস্‌ছে। আমাদের এ অবস্থায় দেখে সে হয় ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে। ওর যা বুদ্ধি, আমাদের মনের দুঃখ ঠিক অনুমান করে নেবে।”

বীরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

MOHEARY ... Estd

নয়

প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানের মধ্য-বিসর্পিত পথে চলিতে চলিতে তরলিকা বিস্ময়ানন্দে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! চমৎকার!"

অধ্যাপক-পত্নী হৈমবতী পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিতেছিলেন। নব-পরিচিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী মুন্‌সেফ্‌ গৃহিণীর এই মন্তব্যে তাঁহার অন্তর প্রসন্ন হইল। তিনিও বিস্ময়মুগ্ধা তরুণীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

সযত্ন-রচিত রজনীগন্ধা, বেলা, যুথিকা, চামেলি, সেফালী প্রভৃতি বাঙ্গালার পুষ্পবৃক্ষগুলির শোভা তরলিকার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল। কোনও বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণে পুষ্পবৃক্ষের এমন বিচিত্র সমাবেশ ও সযত্ন পালন-নৈপুণ্য সে পূর্ব্বে দেখে নাই। নদী-তীরবর্ত্তী এই সাধারণ ভবনটি কুঞ্জবনের স্নেহালিঙ্গনের স্পর্শে দর্শকের চিত্ত অভিনব মাধুর্য্যরসে মুগ্ধ করিয়া দেয়!

তরলিকা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এমনটি আমি কোথাও দেখি নি,—আপনারা খুব সুখী।"

হৈমবতী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ফুল আমরা খুব ভালবাসি, গাছপালারও আমরা খুব ভক্ত; কিন্তু এ সবই আমার মেয়ে গৌরীর সাধনার ফল। আপনার ভাল লেগেছে জেনে বড় তৃপ্তি পেলাম।"

তরলিকা সহসা বলিয়া উঠিল, "আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না। আমি আপনার মেয়ের মত। আমাকে গৌরীর মত তুমি বলেই ডাকবেন। মাসীমা! গৌরী কোথায়?"

হৈমবতী এই তরুণী, সুশিক্ষিতা, মুন্সেফ-গৃহিণীর সৌজন্য ও সরলতায় মুগ্ধ হইলেন। তিনি চলিতে চলিতে ডাকিলেন "গৌরী!—"

গৌরী জানিত মুন্সেফ বাবুর পত্নী তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিবেন। সে পরম্পরায় শুনিয়াছিল, পিতৃবন্ধু প্রতুলবাবুর স্ত্রী অপূর্ব্ব সুন্দরী এবং শিক্ষিতা—ধনী পিতার কন্যা। তাই সে কুণ্ঠাভরে এতক্ষণ নিজের ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। মাতার আহ্বান শুনিবা মাত্র 'যাই মা' বলিয়া সলজ্জ চরণে সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তরলিকা তাড়াতাড়ি গৌরীর কাছে গিয়া বলিল, "এই গৌরী? চমৎকার মেয়ে ত!"

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, "গৌরীর মত ওর রূপ নেই। তবু উনি কেন যে ওর নাম গৌরী রেখেছেন!"

তরলিকা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়াছিল। তাহার দীর্ঘায়ত, কৃষ্ণতার নয়ন যুগলের স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আগুল্ফলম্বিত তরঙ্গায়িত কৃষ্ণ কেশ-রাজির চিক্কন শোভা, সুস্থ সবল, সুডৌল দেহের লাবণ্য, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের অভাবেও হিমালয় নন্দিনী গৌরীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সন্তান-বাৎসল্যে অভিভূত হইয়া যে পিতা কন্যার এই নামকরণ করিয়াছেন, তাঁহার রুচি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

তরলিকা গৌরীর কোমল করযুগল নিজের অনিন্দিত পীবর কর-প্রকোষ্ঠে ধারণ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আজ থেকে তুমি আমার বোন্ আর সইও বটে। আমরা প্রায় সমবয়সীই হব বোধ হয়। তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে, আমিও ডাকব। কেমন ভাই?"

গৌরী এই সদ্যঃ পরিচিতা তরুণীর অমায়িকতায় প্রকৃতই মুগ্ধ হইল। সাধারণতঃ সে বড় একটা কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে চাহিত না।

নিজের মধ্যে অনেক প্রকার দীনতা আছে মনে করিয়া সকল সময়েই সে অনাবশ্যক কুণ্ঠা অনুভব করিত। কিন্তু মুন্‌সেফ্ পত্নীর অমায়িক ও অন্তরঙ্গ ব্যবহারে তাহার অন্তরের সকল সঙ্কোচ অন্তর্হিত হইয়া গেল। সঙ্কোচ গেল, কিন্তু লজ্জা যেন তখনও তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিতেছিল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি—"

তরলিকা তাড়াতাড়ি কোমল করপল্লবে তাহার মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "ছি, ভাই। এই বুঝি তুমি আমার সই?"

কথাটি এমনই একটা অভিমান মিশ্রিত ভালবাসার সুরে উচ্চারিত হইল যে, গৌরী এবার আর অন্তরের হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে সলাজ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা ভাই, মাপ কর এই বারটি, আর বোলবো না।"

তরলিকা অনুযোগের সুরে বলিল, "এই যে মাপ করছি আর কি! আগে চল তোমার ঘরটর দেখাবে চল, তার পর মাপ। তুমি নাকি ভাই খুব চমৎকার ফুলবাগান করেছ? চল দেখাবে চল।"

তরলিকা তাহাকে উত্তরের অবসর না দিয়া একরূপ টানিয়া লইয়া চলিল, গৌরী তাহার সরল অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ। সে পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল হাকিমের গৃহিণী, না জানি কত বড় রাশভারী মানুষ। কিন্তু দুই চারিটি কথাতেই বুঝিয়া লইল, এই হাকিম গৃহিণীর অহমিকার লেশ মাত্র নাই। সে সত্যই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এমন মানুষের বন্ধুত্বের আকর্ষণকে উপেক্ষা করিতে পারে? তরলিকাও প্রথম দৃষ্টিতেই গৌরীর সরলতা মাখা মুখখানি দেখিয়া ও তাহার সলজ্জ সম্ভাষণ শুনিয়া দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মত তাহার অন্তরটির পরিচয় পাইয়াছিল। তাই সে তাহাকে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মনে মনে আপনার করিয়া লইল।

সযত্ন-গোময়-লিপ্ত তুলসীমঞ্চ দেখিয়া তরলিকার মন আরও মুগ্ধ

হইল। নিজের বাসাবাড়ীতে আসিবার পর হিন্দু নারীর প্রাত্যহিক নিত্যক্রিয়ার এই বেদ-পীঠ সে প্রাঙ্গণ ভূমিতে নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিল! প্রতি সন্ধ্যায় সে ভক্তি-নম্র হৃদয়ে তুলসীতলে প্রদীপ দিয়া বাল্যের অভ্যাসকে সঞ্জীবিত রাখিত। গৌরীরও এই অভ্যাস আছে জানিয়া সে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিল। সমধর্ম্মী, সমমতাবলম্বী নরনারীর মধ্যে বন্ধুত্বের বীজ যত শীঘ্র উপ্ত হয়, এমন অন্যত্র সম্ভবপর নহে।

গৌরী তরলিকাকে সঙ্গে লইয়া বসিবার ঘরে গেল। পরিচ্ছন্ন গৃহমধ্যে গৃহবাসীদিগের রুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অপর্য্যাপ্ত নিদর্শন দেখিয়া তরলিকার মন একদিনেই এই পরিবারের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল। স্বামীর নিকট সে বীরেশবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়েই তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবে, ইহা সে পূর্ব্বে প্রত্যাশা করিতে পারে নাই।

সায়াহ্নের সূর্য্য নদীর ওপারে বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিতেছিল। ঘরের বাতায়ন-পথে নদীর জলস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। তরলিকা মুগ্ধ হৃদয়ে বাতায়ন-সন্নিধানে একখানি আসনের উপর বসিয়া পড়িল। পল্লীর শান্ত শ্রী, নদীর বিচিত্র শোভা তাহার চিত্তকে অভিভূত করিল। গৌরীর শান্ত মুখশ্রী অপরাহ্নের মৃদু আলোকরেখায় বড় মধুর দেখাইতেছিল।

তরলিকা বলিল, "ভাই, শুনেছি তুমি না কি বেশ গাইতে পার। গান আমার বড় ভাল লাগে। একটা গাও না, ভাই। যা তোমার ইচ্ছে।"

গৌরীর মুখ লজ্জার অরুণরাগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমার গান শুন্‌তে কি আপনার ভাল লাগবে?"

তরলিকা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আবার আপনি বলছ! না ভাই, ও সব লৌকিক শিষ্টাচার বোনের কাছে, সইএর কাছে আমি পেতে চাই নে। তোমার বাবা খুব চমৎকার গাইতে পারেন শুনেছি। তুমি তাঁর কাছেই গান শিখ্‌ছ, জানি। তোমার ও রকম বিনয়ে আমি ভুলছি না।"

গৌরী বলিল, "বাবা খুব ভাল গান জানেন, সে কথা সত্যি, কিন্তু ভাই আমি ত কিছুই এখনও শিখতে পারি নি।"

তরলিকা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে বুঝব'খন। এখন তুমি একটা গাও ত, ভাই।"

লঘুচরণে গৌরী গৃহপ্রান্তে রক্ষিত এস্রাজটা তুলিয়া আনিয়া বলিল, "আমি এস্রাজের সঙ্গেই গেয়ে থাকি। অর্গান আমার ভাল লাগে না।"

তরলিকা বলিল, "সেই ভাল।"

এস্রাজটা লইয়া গৌরী তারগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তারপর সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া সে গান ধরিল—

"আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ !"

ছায়া ও আলোক পৃথিবীর বুকে তখন নৃত্য করিতেছিল। অগ্রগামিনী নারীর লঘু, মন্থর চরণ-ক্ষেপের তালে তালে ম্লান মুখে বিরহ-ব্যথিত আলোক শ্রান্ত চরণে বিদায় লইতেছিল। গানের সুরে সুরে ভক্ত হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা ও আশার বাণী যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে !

গায়িকা কণ্ঠস্বর উচ্চ সপ্তমে তুলিয়া গাহিল—

"চির আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি,
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ ;
'ও পথে যেও না, ফিরে এস'—বলে
কাণে কাণে কত কয়েছ !
(আমি) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ !"

তরলিকা স্পন্দনহীন নেত্রে সুকুমারী তরুণীর ভাবসমৃদ্ধ আননের প্রতি চাহিয়া এই অপূর্ব্ব সুর-তরঙ্গের খেলা সমস্ত প্রাণ দিয়া শুনিতেছিল। ইহা ত শুধু সুর-তান-জ্ঞান-প্রবীণা গায়িকার গীতির ঝঙ্কার নহে। ইহা যে একনিষ্ঠ সাধকের অন্তর্নিহিত ভক্তি নিবেদন !

না, সত্যই কোনও নারীকণ্ঠে এমন অভিব্যক্তিপূর্ণ মধুর সঙ্গীত সে পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। বিমুগ্ধ চিত্তে সে শুনিতে লাগিল—

" (এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি মুখে তুমি বয়েছ ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে করে নিয়ে রয়েছ !"

ঘুরিয়া ফিরিয়া সঙ্গীত-ধ্বনি কক্ষমধ্যস্থ বায়ুরাশিকে পুলকিত করিয়া বাহিরের সন্ধ্যার বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল।

এস্রাজের তারে শেষ ঝঙ্কার তুলিয়া গৌরী যন্ত্রটি এক পাশে রাখিয়া দিল।

তরলিকা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে গৌরীকে আবদ্ধ করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিল, "সার্থক তোমার গান শিক্ষা, সই! সত্যি তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হচ্ছে!"

গৌরী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "ছিঃ! দিদি! আমাকে আর লজ্জা দিও না।"

তরলিকা গাঢ়কণ্ঠে বলিল, "একটুও অত্যুক্তি নেই, খাঁটি সত্য কথা, প্রাণের কথা বলছি। তোমার এ গান শুন্‌লে অতিবড় পাষাণের চোখেও জল আসে।"

দাসী ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল।

তরলিকা মুহূর্ত্ত পরে বলিল, "ভাই, দুঃখের গান শুন্‌লে চোখে জল আসে। হাসির গান কি তোমার ভাল লাগে না?"

"না, ভাই, এই রকম গানই আমার প্রিয়। আমি বাবার কাছ থেকে বেছে বেছে রজনী সেন, রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গানই শিখেছি। অন্য গানও গেয়ে থাকি, কিন্তু আমার মন তাতে যেন ঠিক সাড়া দিতে চায় না।"

তরলিকা বাহিরে চাহিয়া দেখিল, নদীর জলে অন্ধকারের তরল ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পর পারের শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজির যবনিকার অন্তরালে যেন কত রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে। সে নিবদ্ধদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিল। এই তরুণীর দেহান্তরালস্থিত অন্তরের ভাবধারার সন্ধান কি সে পাইয়াছে?

তাহার মনে হইল, গৌরীকে যদি সে ভ্রাতৃজায়ারূপে পাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার দাদা নিশ্চয়ই সুখী হইতেন। কিন্তু অনিলচন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যের গভীরতা ও নিষ্ঠার কথা মনে পড়িতেই তাহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া গৌরী তরলিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হল, দিদি ?"

কিন্তু তরলিকা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হৈমবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, একটু মুখ হাত ধোবে চল।"

গৌরী বলিল, "আমিও এতক্ষণ তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে, লক্ষ্মীর আসনটা দিয়ে আসি।"

তরলিকা বলিল, "তুমি রোজ লক্ষ্মীর আসন দেও না কি, বোন্ ?"

গৌরী মৃদু হাসিয়া মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তরলিকাও হাসিতে হাসিতে বলিল, "লক্ষ্মীর আসনটি দেওয়া হচ্ছে বুঝি নারায়ণটির জন্যে ভাই ?"

গৌরী এবার লজ্জায় একবারে যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল। তরলিকা সস্নেহে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছি ভাই লজ্জা কিসের ? সত্যি বলছি ভাই, তোমার এই পূজো আচ্ছা দেখে আমারও ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে গিয়ে সন্ধ্যে দিয়ে লক্ষ্মীর আসন দিয়ে আসি। যাও ভাই, তুমি এ বাড়ীর লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর আসন দিয়ে এসো, আমি ত আর এ কাপড়ে যাবো না। তুমি এখন কাপড়-চোপড় ছাড়বে, যাও দেরী কোরো না।"

গৌরী চলিয়া গেল।

তরলিকার মনে হইল, পিতৃগৃহে সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় মা লক্ষ্মীর পূজা করিয়া লক্ষ্মী ব্রতের কাহিনী সুরে সুরে গান করিত। কিন্তু বিবাহের পর আর সে কার্য্যের অবকাশ পায় নাই। স্বামীর সহিত কর্ম্মস্থলে আসিবার পর লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করিতেও ভুলিয়া গিয়াছে! হিন্দু নারীর পক্ষে এ অবহেলা সঙ্গত নহে। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, আগামী কল্য হইতেই সে আবার স্বামীগৃহে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া ধন্য হইবে।

দশ

বীরেশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হাঁ, তোমার পছন্দ আছে বটে ; কিন্তু উপায় নেই। অনিলচন্দ্রের ধনুকভাঙ্গা পণ, বিয়ে সে কোন দিনই করবে না।"

হৈমবতী বলিলেন, "তুমি একটু যত্ন করে দেখ দেখি না, করবে না! বেটা ছেলে অমন এ বয়সে বলে থাকে। তরুকে বলেছিলাম, তার খুব আগ্রহ আছে। প্রতুল বাবুরও মত আছে বলে শুনেছি। এরা দুজন খুব ভাল লোক, বিশেষ তরু মেয়েটি বড্ডো ভাল।"

বীরেশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ত আমিও জানি। প্রতুলবাবুও মাটির মানুষ, এমন অমায়িক ভদ্রলোক আমি খুব কমই দেখেছি। প্রতুলবাবুর ভারী ইচ্ছে গৌরীর সঙ্গে তাঁর শালার বিয়ে হয়। কিন্তু যে বিয়ে করবে, তারই যে শুকদেব গোস্বামীর মত প্রতিজ্ঞা।"

হৈমবতী কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?"

অধ্যাপক পত্নীর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

হৈমবতী মৃদুস্বরে বলিলেন, "একদিন কৌশল করে গৌরীকে দেখিয়ে দাও—তার গান শুনিয়ে দাও। মানুষের মন ত!—"

বাকী যে কথাগুলি হৈমবতী বলিতে চাহিতেছিলেন, তাহা আর বলা হইল না।

বীরেশচন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেটির পরিচয় ভাল করে পাওনি ; তাই বলছ। আজ ক'মাস ধরে আমি ওর সকল বিষয় লক্ষ্য

করে আস্‌ছি—ওর সকল মন্তব্য মন দিয়ে শুনে আসছি। নারীজাতিকে অনিল মায়ের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করে। শক্তিরূপিণী নারীর প্রতি তার গভীর সম্ভ্রম-বোধ; কিন্তু কোন নারীকে অঙ্কলক্ষ্মী করে তোলবার ও ঘোর বিরোধী। কেন এমন মত, তার কোন সঙ্গত কারণ তার মুখ থেকে এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি।"

বিরস বদনে হৈমবতী বলিলেন, "তবু একবার ভাল মতে চেষ্টা করে দেখ না! সেদিন ডেপুটীবাবুর বাড়ী ছেলেটির কি প্রশংসা শুনে এলুম!"

অধ্যাপক অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "সারা সহর শুদ্ধ লোকই অনিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জেলার হাকিম, জজ, ডাক্তার সাহেব—একবাক্যে সকলেই এই শান্ত স্বভাব, ক্রীড়াবিদ্, পণ্ডিত ছেলেটির প্রশংসা করে থাকেন। আমাদের প্রিন্‌সিপাল বলছিলেন, দশহাজারে এমন একটি ছেলে পাওয়া যায় না।"

আনমনে হৈমবতী বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর, মিষ্টি চেহারা!—"

উত্তেজিত ভাবে বীরেশ বাবু বলিলেন, "শুধু তাই? গুণের কথা শোন। কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী নৌকায় বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দাঁড় ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জলে পড়ে যান। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সঙ্গে ছিলেন, তিনিও জুতো জামা সমেত তাড়াতাড়ি জলে লাফিয়ে পড়েন। কিন্তু মেম সাহেবকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, সেই বোঝা সমেত তিনি হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করেন। অনিল তখন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিকে লোকজন মোটেই ছিল না। অনিল দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি জুতো জামা খুলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছোকরার গায়ে যেমন অসীম ক্ষমতা, সাঁতারেও তেমনি ওস্তাদ। সাহেব মেমকে সে কৌশলে দুই হাতে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তীরে নিয়ে আসে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এজন্য তার ওপর এমন খুসী হয়েছেন যে, কাল সন্ধ্যার

পরই সহরের যে সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁদের কাছেই মুক্তকণ্ঠে অনিলের প্রশংসা করেছেন। আজ এজলাসে এসে উকীল মোক্তারদের কাছেও সে সব কথা বলেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী নিজে আজ তাকে বাংলোয় ডেকে নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।”

বলিতে বলিতে বীরেশচন্দ্র সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার আননে একটা প্রসন্ন দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনিলচন্দ্রের প্রশংসা শুনিয়া হৈমবতীর নারীহৃদয় এই যুবকের জন্য আরও আকুল হইয়া উঠিল। এমন পাত্রে যদি তাঁহার গৌরীমাকে অর্পণ করিতে পারিতেন!

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “এমন ছেলেকে যে মেয়ে দিতে পারবে, সে কত জন্ম তপস্যা করেছে? আমার বরাতে কি সে সুখ আছে!”

অধ্যাপক কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, “সহরের ছেলের দল অনিলের এমন ভক্ত হয়ে পড়েছে যে, তার মুখের সামান্য কথায় তারা যেন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। মহাত্মাজীর আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের এই সহরেও তার প্রবল ঢেউ এসেছে। কিন্তু অনিলের আদর্শে ছেলেরা এমন মুগ্ধ যে, তারা নিঃশব্দে চরকায় সুতো কেটে চলেছে। কোথাও কোন উত্তেজনা নেই। নীরবে কেমন করে মাতৃভূমির সেবা করা যায়, এই ক'মাসে অনিল তা দেখিয়ে দিয়েছে। এজন্য জেলার কর্ত্তারাও তার উপর রাগ করা দূরে থাকুক, ভারী সন্তুষ্ট।”

হৈমবতীর হৃদয় যেন গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “তুমি অনিলকে একদিন এখানে নিয়ে এস। গৌরীর গান শুনিয়ে দাও। তাকে দেখ্‌লে অনিলের মন হয় ত ফিরে যেতেও পারে।”

বীরেশ বাবুর পিতৃহৃদয়, পত্নীর এই আশ্বাস বাক্যে হয় ত বা একটু

আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার চেষ্টার ক্রটি হবে না। কিন্তু অনিলের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে ত ভরসা হয় না।"

হৈমবতী দ্বার-পথে প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া ছিলেন। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে তলসীমঞ্চের তলে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বস্ত্রাঞ্চল গলদেশে রাখিয়া গৌরী নত হইয়া প্রণাম করিল। প্রদীপের আলোক-শিখা গৌরীর স্নিগ্ধ মুখে নৃত্য করিয়া উঠিল।

মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকে আর এমন ভাবে রাখা কোন মতেই চলে না। জীবনের সুন্দরতম মুহূর্ত্তগুলি স্বামিগৃহে, স্বামিসহবাসে যদি সার্থকতা লাভ করিতে না পায়, তাহা হইলে জীবন কি দুর্ব্বহ হইয়া উঠে না—ব্যর্থ হইয়া যায় না?

বীরেশ বাবু ডাকিলেন, "গৌরী মা, তোমার হয়েছে?

"যাই বাবা," বলিয়া গৌরী ধীর পদে সোপান পথ অতিক্রম করিয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইল।

তাহার প্রসন্ন মুখে পূর্ণ শান্তির মধুর শ্রী।

কন্যা পিতার পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে বীরেশচন্দ্র তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "তোমার সব কাজ হয়ে গেছে ত, মা?"

গৌরী উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, বাবা।"

"তবে এইবার বই নিয়ে এস! আজ বাল্মীকির রামায়ণের বনবাসের অধ্যায়টা তোমাকে শেষ করতে হবে।"

গৌরী ধীরপদে মূল রামায়ণখানি আনিয়া উজ্জ্বল প্রদীপালোকে পড়িতে বসিল।

শ্রীরামচন্দ্র সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীকে বনগমনে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানাবিধ বিপদ ও আশঙ্কার কথার উল্লেখ করিবার পর জনকনন্দিনী তেজোগর্ভ বাক্যে যখন পতিকে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা কি একজন

কাপুরুষের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ? তখন গৌরীর হৃদয় যেন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, হাজার হাজার বছর আগের হিন্দু স্ত্রীর এই কথা বাল্মীকির লেখায় অমর হয়ে নেই কি?"

কন্যার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বীরেশচন্দ্র বলিলেন, "তুই ঠিক ধরেছিস্ মা। সীতা বীরের কন্যা, বীরের পুত্রবধূ, মহাবীরের সহ-ধর্ম্মিণী। তাঁর মুখে এই রকম উক্তিই শোভা পায়। কিন্তু হিন্দুর মেয়েরা এ যুগে সে মহা আদর্শের কথা ভুলে গেছে।"

তখন পিতা ও পুত্রী আবার রামায়ণের মধুর কাব্য-মাধুর্য্য ও চরিত্র সৃষ্টির অনবদ্য মহিমার মধ্যে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

হৈমবতী নিজের কাজ সারিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যার পর নিত্যই প্রায় এরূপ পাঠ চলিত।

এগার

"চলুন অনিলবাবু। বীরেশবাবু বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হতে পারেন। আরও অনেকে ত উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন আমাদের জন্যে।"

অনিলচন্দ্র ভগিনীপতির তাড়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "এখনও সন্ধ্যার ঢের দেরী, প্রতুলবাবু।"

"তা না হ'ক। ওঁর বাড়ীটা নদীর ধারে। জায়গাটা ভারী সুন্দর। নদীর শোভা এমন চমৎকার সেখানে। অস্তগামী সূর্য্যের দৃশ্যটা উপভোগ করা যাবে, চলুন।"

অনিল হাসিয়া বলিল, "মশাই যে আদালতের ডিক্রী ডিসমিস ছেড়ে মস্ত বড় একটা কবি হয়ে পড়েছেন, তা ত জানা ছিল না। তা কবে থেকে—"

প্রতুলচন্দ্রও তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "যবে থেকে মশায়ের মত প্রকাণ্ড পণ্ডিত সাহিত্যিকের সহোদরা মহাশয়ার কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশ্রেণীতে নাম লিখিয়েছি",—বলিয়া হো হো হাসিয়া উঠিলেন।

অনিলচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দেখুন, ওগুলো নেহাৎ সেকেলে রসিকতার পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে না?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বটে নাকি? তা দেখুন অনিলবাবু আমরাও আপনার মত এখনও একেলে হতে পারিনি—কাজেই দেশের এ সব হাসি তামাসাগুলো বার্ক সেক্সপিয়ারের রসের সাগরে ভাসিয়ে দিতে পারি নি। তা না হয় এখন থেকে ডিকেন্স টিকেন্স থেকে বেছে বেছে রসিকতা

আওড়াতে আরম্ভ করা যাবে, কি বলেন? দুঃখ এই, আপনার সহোদরা সে সবের তারিফ—"

অনিলচন্দ্র মহা অস্বস্তি বোধ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল,—"তরলিকাও যাবে ত। সে কি এর মধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছে?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বোন্ কি বাড়ী আছেন নাকি? দুপুরবেলা বীরেশবাবুর ওখানে তিনি চলে গেছেন।"

অনিলচন্দ্র চরকার সুতা নাটাইয়ে গুটাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর প্রতুলচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "বীরেশবাবুর বাড়ী আজ কিসের উৎসব? অনেক লোকজন হবে নাকি?"

"কিছু না; শুধু আমরা। আপনাকে তাঁর বড় ভাল লাগে। তাই আমাদের ক'জনকে নিয়ে ছুটির দিনের সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে করিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "বাস্তবিক বীরেশ বাবু বড় চমৎকার লোক। যেমন পূত চরিত্র, তেমনই সদালাপী ও পণ্ডিত। সত্যি আমারও তাঁকে খুব ভাল লাগে।"

কি একটা কথা বলিতে গিয়া প্রতুলচন্দ্র থামিয়া গেলেন।

খদ্দরের চাদরখানা খুলিয়া গায় দিয়া অনিলচন্দ্র বলিল, "তবে চলুন।"

উভয়ে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীরেশবাবুর বাড়ী অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। অপরাহ্নের আলোকে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন। সূর্য্য তখনও পশ্চিম আকাশে আবীর ছড়াইতেছিলেন।

যাইতে যাইতে অনিল বলিল, "না, যা বলেছেন, নদীর ধারটা সত্যিই চমৎকার! নদীর জলে ঐ সূর্য্যের রাঙ্গা আভা কেমন সুন্দর ঝিকমিক

করছে! আমাদের বাঙ্গালা মায়ের পল্লীর শোভার কাছে আমার আর কোথাকারও সিনারি ভাল লাগে না। কি চমৎকার স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা!"

প্রতুলবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "বলি মশাই, কবিটা কে, আমি না আপনি? না, না, লজ্জিত হবেন না, যা বলেছেন তার একটি কথাও মিছে নয়। আমি ত এই জন্যেই পাড়াগাঁ ভালবাসি।"

অনিল বলিল, "একে আর পাড়াগাঁ বলবেন না। তবে কলকাতার ইঁটের পাঁজার চেয়ে এখানে যে দেখবার আর আনন্দ পাবার ঢের বেশী জিনিষ আছে—আঃ এ সব সিনারী যদি মণীশ আঁকবার সুযোগ পেতো!"

প্রতুলবাবু অনিলচন্দ্রকে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা খুবই বেশী, না? তা, আপনি ত তাঁকে এখানে আনলেই পারেন।"

নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হইল।

প্রতুলচন্দ্র নদীর তীরবর্ত্তী নাতিবৃহৎ প্রস্ফুটিত কুসুমচিত্রিত, লতা-বেষ্টিত প্রবেশ পথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন! রাজপথের দক্ষিণ দিকে যে দ্বার বিদ্যমান, সে দিক দিয়া না প্রবেশ করিয়া এই পথটি তিনি বাছিয়া লইলেন। বীরেশবাবুর গৃহে নদীর দিকের এই মনোজ্ঞ পথে তিনি দুইবার অধ্যাপকের সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুরের উদ্যানের একাংশ এই দিকে থাকা সত্ত্বেও বাহিরের লোকের পক্ষে এ দিক দিয়া প্রবেশের বিশেষ বাধা নাই।

অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্য্য তখন নদীর অপর পারের বৃক্ষরাজির

অন্তরালে ঢলিয়া পড়ে নাই। সোণার কিরণে হেমন্তের সায়াহ্ন স্বপ্নলোকের মায়ায় মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

কঙ্করাকীর্ণ পথে একটু অগ্রসর হইতেই অনিলচন্দ্র সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রতুলচন্দ্র শ্যালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দাঁড়ালেন যে?"

অনিলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদের এ পথে আসা উচিত হয় নি। ঐ দেখুন।"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অদূরে রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে একটি তরুণী নিবিষ্টমনে সন্তর্পণে ফুল সংগ্রহ করিতেছে। তাহার এলাইত সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশরাজির একাংশ দেখা যাইতেছে। মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই। পরিহিত বাসন্তী বর্ণের বসনের উপর অস্তগামী সূর্য্যের আলোক-সম্পাতে তরুণীর দেহ-সুষমা যেন অপ্সরালোকের দেবকন্যাগণের মাধুর্য্য-মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রতুলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন, "মেয়েটি বীরেশবাবুর। অনূঢ়াকে দেখে চিরকুমারের সঙ্কোচ বড় বিস্ময়ের বিষয় বটে!"

অনিলচন্দ্র বলিল, "অন্য রাস্তা আছে ত; চলুন সেই দিক দিয়েই যাই।"

এমন সময় গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তাহার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য চকিত হইয়া উঠিল। লজ্জার অরুণ রেখা আননে ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সংযত ও লঘু পদক্ষেপে অন্তঃপুরের প্রবেশ-পথের দিকে চলিয়া গেল। তাহার গতিভঙ্গীতে বিচিত্র মাধুর্য্য লীলায়িত হইয়া উঠিল।

শ্যালকের মুখের দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিয়া প্রতুলচন্দ্র সহজ ভাবে চলিতে লাগিলেন। অনিলের মুখভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যের অটুট ছায়া দেখিয়া তাহার অন্তরের ভাব-বৈচিত্র্যের কোন আভাস তাঁহার তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আবিষ্কার করিতে পারিল না।

"মেয়েটি বড় ভাল বলে শুনেছি। বীরেশবাবু নিজে বাড়ীতে শিক্ষা দিয়ে ওঁকে বিশেষ গুণবতী করে তুলেছেন, কিন্তু ভাল পাত্র আজও জুটল না।"

অনিলচন্দ্র সংক্ষেপে বলিল, "বাঙ্গালার ঘরে ঘরেই এম্‌নি অবস্থা।"

প্রতুলচন্দ্র কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বীরেশবাবু বাহু প্রসারিত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

"আসুন, আসুন। আজ বড় আনন্দ পেলাম।"

উভয়কে আবেগভরে কাছে টানিয়া আনিয়া সরলপ্রাণ শিক্ষক মুহূর্ত্ত কাল উভয়ের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন। তার পর, পথ দেখাইয়া অতিথি যুগলকে বসিবার ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারি দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "আপনার এই বাগান, বাড়ী; এ সব শিল্পীর তুলিতে আঁকবার যোগ্য। আমার এক চিত্র-শিল্পী বন্ধু আছেন, তাঁকে এখানে আন্‌তে পারলে এই রমণীয় দৃশ্যের মর্য্যাদা তিনি তুলিতে অমর করে তুলতে পারেন।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আপনার কোন বন্ধু, অনিলবাবু? আমি কি তাঁকে দেখেছি?"

মৃদুশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "না, তাঁকে আপনি দেখেন নি। তবে নাম শুনেছেন,—তা'ত আপনিই খানিক আগে বলেছেন। এখনকার তরুণ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তাঁর মত আমি আর কাউকে মনে করি না।"

চিত্রশিল্পের দিকে বীরেশ বাবুরও সমধিক অনুরাগ ছিল। কন্যা গৌরীকেও চিত্র-বিদ্যার অনুরাগিণী দেখিয়া তিনি তাহাকে নিজের সামর্থ্যানুসারে চিত্রাঙ্কনে সাহায্য করিতেন।

বীরেশবাবু বলিলেন, "কার কথা বল্‌ছেন, অনিলবাবু?"

চিরন্তনীর জয়

সোপানপথে বারাণ্ডায় উঠিতে উঠিতে অনিল বলিল, "মণীশ গুহের নাম হয়ত আপনারা শুনে থাকবেন। আজকাল—"

বাধা দিয়া বীরেশ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "মণীশ গুহ ত সত্যি একজন মস্ত চিত্রকর। খুব নাম শুনেছি। বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে মণীশবাবুর ছবি প্রায়ই দেখ্‌তে পাই। তিনি আপনার বন্ধু?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এ নাম আমারও জানা মনে হচ্ছে। এরই সঙ্গে ত—হাঁ কাগজে দেখ্‌ছিলাম এবার কলকাতার চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ছবির খুব প্রশংসা হয়েছে।"

অনিলচন্দ্র গাঢ়স্বরে বলিল, "তাঁর শিল্প-সাধনার নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কথা আপনারা জানেন না। আমি গোড়া থেকেই জানি। মণীশের প্রতিভা একদিন বাঙ্গালী জাতকে শিল্প-রসিক বলে সভ্যসমাজে পরিচিত করে দেবে, এই আমার বিশ্বাস"

বীরেশবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতিথিযুগলকে বসাইয়া বলিলেন, "আমার মেয়ে গৌরীও মণীশবাবুর ছবির ভারী গোঁড়া ভক্ত।"

প্রতুলবাবু বলিলে, "আপনার মেয়েকে চিত্র-বিদ্যাও শেখাচ্ছেন না কি?"

স্মিত-হাস্যে বীরেশচন্দ্র বলিলেন, "মা আমার সকল রকম ললিত কলারই ভক্ত; কিন্তু শেখাবার লোকের অভাবে তার শক্তির মত শিক্ষা দিতে পাচ্ছিনে।"

প্রতুলচন্দ্র অনিলের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কি দেখিলেন। তার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কলকাতায় থাক্‌লে আপনি ঠিক মত শেখাবার লোক হয়ত পেতেন!"

বীরেশবাবু বলিলেন, "ভাল শিক্ষকের হয়ত অভাব নেই; কিন্তু একটা কথা হয়ত আপনি লক্ষ্য করছেন না। শিক্ষা দেবার যোগ্য শক্তি

থাকলেও যুবতী কন্যাদের কাছে শিক্ষকের পবিত্র দায়িত্ব রক্ষা করে চলবার মনোবৃত্তির কয় জন লোক পাওয়া যায় ?”

অনিলচন্দ্র এতক্ষণ নীরব ছিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, “বীরেশ বাবুর সহিত আমি এ বিষয়ে একমত। পুরুষের মত পুরুষের সংখ্যা এ যুগের নাস্তিক শিক্ষাদানের ফলে বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত কমে যাচ্ছে।”

প্রতুলচন্দ্র কোন প্রতিবাদ করিলেন না। বোধ হয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান এই মতবাদের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

MOHENNY PUBLIC LIBRARY

বার

সন্ধ্যার আকাশে সপ্তমীর চাঁদ, সন্নিহিত নদীর চঞ্চল বক্ষে লক্ষ চূর্ণ রেখা! অনিলচন্দ্র মুগ্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার এ জায়গাটি দেখলে বড় লোভ হয়। বড় আনন্দে আছেন আপনি, বীরেশবাবু।"

প্রতুলচন্দ্র আলবোলার নলটি তুলিয়া বলিলেন, "সে কথা হাজারবার।"

বীরেশবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "টাকার পূজো কোন দিন করিনি, তবে শান্তিতে দিন কাটাবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। তিনি এইটুকু করেছেন বলে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাইনে, প্রতুলবাবু।"

কথাগুলির মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ের যে অভিব্যক্তি বীণাগুঞ্জনের ধ্বনিতে ব্যক্ত হইল, তাহাতে অনিল মুগ্ধ হইল। সে বলিল, "যিনি সকল অবস্থাতেই মনকে শান্ত রাখার সাধনা করেন, ভগবানের দয়া তাঁর উপর অজস্রধারেই বর্ষিত হয়।"

প্রতুলচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্বের কক্ষ হইতে বীণাধ্বনিবৎ মধুর কণ্ঠের তরঙ্গ উত্থিত হইতেই তিনি থামিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিল—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা!"

তরুণীর মধুস্রাবী কণ্ঠে এইরূপ ধরণের সঙ্গীত কি বিস্ময়কর নহে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রগতিপরায়ণ যুগে?

প্রতুলচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, অনিলচন্দ্র বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। তাঁহার অন্তরে যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার শ্যালকের মনে বয়োধর্ম্মের সামঞ্জস্য হেতু কি অনুরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে?

"জনমের শোধ ডাকি মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।"—

এ সঙ্গীত তাঁহার পত্নী তরলিকার কণ্ঠনিঃসৃত নহে নিশ্চয়ই। বীরেশ-বাবুর কন্যাই এমন কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী। কিন্তু এই তরুণ বয়সে গানের অভিব্যক্তিতে কুমারী কন্যার হৃদয়ব্যথা এমন ঔদাস্যব্যঞ্জক কেন? গান নির্ব্বাচনের সহিত অন্তরের কি কোন যোগাযোগ আছে?

প্রতুলচন্দ্র আইনজ্ঞ বিচারক। মনস্তত্ত্বের রাজ্যে তিনি দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চিত্ত অভিভূত হইল।

"পৃথিবীর কেউ ভাল ত বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,—
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা!"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অনিলচন্দ্র প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। তিনি একবার আসনের উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

এস্রাজের সুরকে ছাপাইয়া—অতিক্রম করিয়া কণ্ঠধ্বনি সপ্তমে উঠিল—

"বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি,

অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না,
(আমার) বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা !”

ক্রন্দনের সপ্তসমুদ্র যেন সত্যই সে কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ! ভাদ্রের কুলভরা জাহ্নবীর পবিত্র প্রবাহধারার ন্যায় যেন সে সঙ্গীত-স্রোত শ্রোতৃবৃন্দকে ভাসাইয়া, অভিভূত করিয়া বহিয়া চলিল।

প্রতুলচন্দ্রের হৃদয় অশ্রুসিক্ত হইল, নয়নেও মুক্তা-বিন্দু দুলিয়া উঠিল। অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার এ মানসিক দুর্ব্বলতা বীরেশবাবু অথবা অনিলচন্দ্রের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে কি না।

বীরেশবাবু মৃত্তিকা-নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। অনিলচন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে খদ্দরের রুমাল বাহির করিয়া মুখের উপর বুলাইয়া লইল।

গান থামিয়া গেলে কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কোন কথা কহিলেন না। সঙ্গীতের স্বর তখনও যেন একটি ব্যথাদীর্ণ নারীর অন্তরের ক্রন্দন-গুঞ্জন বাতাসে এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

প্রতুলচন্দ্র সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, “বীরেশ বাবু, এ গান নিশ্চয়ই আপনার মেয়ে গৌরী গেয়েছেন ?”

অধ্যাপক মৃদুস্বরে বলিলেন, “হ্যাঁ, আমার মা লক্ষ্মী সেবার কি এক খানা নাটকের অভিনয় দেখে এসে এই গানটা শিখেছিল। সাহিত্যের দিকে মার আমার বিশেষ ঝোঁক। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি মার আমার অচলা ভক্তি। কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি ওর কাছে নাকি বড় প্রিয়।”

অনিলচন্দ্র এবার ফিরিয়া বসিয়া ঔৎসুক্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, “বলেন কি, স্যার ! এ যুগে—এই বিচিত্র প্রগতির স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে নরনারী যখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে,—তখন আপনার মেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন ? আশ্চর্য্য !”

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তার মানে?"

মৃদু হাসিয়া অনিলচন্দ্র তীব্রকণ্ঠে বলিল, "মানে খুব সহজ। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরং' দেশবরেণ্য, পৃথিবীবরেণ্য হলেও, নব যুগের অনেকের ধারণা, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা এ যুগের সঙ্গে খাপ খায় না। নিতান্ত সেকেলে তিনি—মনস্তত্ত্বের চিত্রকর হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীতেই তাঁকে রাখা না কি সঙ্গত!"

বীরেশচন্দ্র এবার উচ্চ হাস্যধ্বনিতে কক্ষতল মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তারপর বলিলেন, "আপনারও কি সেই মত নাকি, অনিলবাবু?"

অনিলচন্দ্র সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার সমস্ত জীবনটা ঐ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের আদর্শে গঠিত। উপন্যাস পাঠের ফলে তরুণদের চরিত্র বজায় থাকে না বলে, 'আমাদের অভিভাবকদের মত ছিল; কিন্তু আমি গর্ব্ব করে বলতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টি আমাকে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে দিয়েছে।"

ভাবাতিশয্যে যুবকের আননে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি সমুজ্জল হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর আবেগভরে বলিয়া চলিল, "তাঁকে কখনও দেখি নি। আমার জন্মের বহু আগেই তিনি লোকান্তরে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ও রচনা আমার সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে রেখেছে। প্রতুলবাবু হয় ত এ কথা শুনে হাস্‌বেন; কিন্তু—"

অনিলচন্দ্র বক্তব্য শেষ করিল না। ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িল।

হাসিতে হাসিতে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ও বিষয়ে একচেটে অধিকার যে শুধু একলা আপনারই আছে অনিলবাবু, তা মনে করবেন না। ভক্ত পাঠকের সংখ্যা আরও অনেক আছে।"

চিরন্তনীর জয়

আকাশপটের চন্দ্রের স্নিগ্ধ দীপ্তির মাধুর্য্য সম্মুখের পুষ্পবনে ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছিল। অনিল বলিল, "বাইরে আসলে কেমন হয়, প্রতুলবাবু?"

বীরেশবাবু বলিলেন, "তা খানিক বসা চল্‌তে পারে। তবে বেশীক্ষণ বাইরের শিশির আপনাদের সহ্য হবে কি?"

প্রতুলচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এখনো হিমের প্রতাপ তেমন প্রবল হয় নি, বীরেশবাবু। তা ছাড়া সাম্‌নে নদী। আপনি বৈজ্ঞানিক, সুতরাং এখানে শিশিরের উৎপাত তত বেশী হবে না, এ আপনি ভালই জানেন।"

এক পাশে যুঁই ঝাড়ের ধারে খানিকটা স্থান বাঁধান ছিল। সেখানে মাদুর পাতিয়া বীরেশবাবু অতিথি যুগলকে বসাইলেন।

কথায় কথায় গৌরীর প্রসঙ্গ প্রতুলচন্দ্র তুলিলেন। এমন গুণবতী কন্যার জন্য একটি গুণবান সৎপাত্র বীরেশবাবু এখনও পান নাই, এজন্য প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

বীরেশবাবু স্নিগ্ধ প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিলেন, "বর্ত্তমান যুগে মানুষ রূপ ও রূপেয়াই চায়, মুন্সেফবাবু। আমার ঘরে এ দুয়েরই অভাব। সুতরাং গুণবান সৎপাত্র আমার কাছে দুর্লভ হয়েই আছে।"

অনিলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনার মেয়েকে বোধ হয় আমি দেখেছি। তিনি ত রূপহীনা নন, স্যার।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমিও দেখেছি। ওঁর মেয়েকে দেখে যে কোন মানুষ মুগ্ধ হবে, এ আমার ধারণা। কিন্তু তবু আপনি কেন ভাল পাত্র পাচ্ছেন না বীরেশবাবু, আমি এখনও বুঝতে পারছি না।"

"আমার ভাগ্য!"

সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় অধ্যাপক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্দরের দিকে গমন করিলেন।

ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল। গড়গড়ার নল তুলিয়া লইয়া টানিতে টানিতে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আজকাল দেখছি, অনেকেরই ধারণা, বেশী উপার্জ্জন না করে বিয়ে করা উচিত নয়। তারা যৌবনের শ্রেষ্ঠভাগটা যেভাবে অবহেলা করে, তাতে বাঙ্গালীর মত স্বল্প-জীবী জাতের পক্ষে মোটেই ভাল নয়।"

অনিল বলিল, "আপনিও ত সেই যুগেরই মানুষ, প্রতুলবাবু। আপনি এখনও বুড়ো হন নি।"

"কিন্তু আমার মনের ভাব আলাদা। যথাসময়েই বিয়ের নাগপাশে নিজেকে ধরা দিয়েছি। আপনাদের মত কৌমার্য্যকে বরণ করে জীবনকে বিফল করে তুলি নি।"

উচ্চ হাস্যে প্রতুলচন্দ্র কাননতল মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

অনিলচন্দ্র সহসা গম্ভীরভাবে বলিল, "যাদের একদিন বিয়ে করতেই হবে, যৌবনকে কল্পনার স্বপ্নে ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের শেষকালে বিয়ে করার বিরুদ্ধে আমি চিরদিন লড়াই করে যাব। যারা ঐ রকম মত প্রকাশ করে, তারা বিদেশের অক্ষম অনুকরণ ক'রে সভ্য সাজতে চায়। ভারতবর্ষ যে ইয়োরোপ নয়, এ জ্ঞান তাদের নেই। কিন্তু যারাই কৌমার্য্যকে বরণ করে চলে, তাদের সকলের জীবনের বা মনের ইতিহাস ত আমরা জানি না। হয় ত বিয়ে না করবার অন্য কারণও থাকতে পারে!"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অনিলচন্দ্রের আননে একটা বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। শ্যালকের মনের মধ্যে কি তবে কোন গোপন ব্যথা আছে? ব্যর্থ প্রণয়?—না, সে রকম কোন আভাস

ত এ পর্য্যন্ত তিনি পান নাই। তাঁহার পত্নীর নিকট হইতেও এমন কোন কথা তিনি জানিতে পারেন নাই, যাহাতে অনিলচন্দ্রের বিবাহে বিতৃষ্ণার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে।

ধীরে ধীরে তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না।

বীরেশবাবু তখনও বাহিরে আসিতেছেন না দেখিয়া অনিলচন্দ্রের দিকে একটু সরিয়া বসিয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বীরেশবাবুর মেয়েটি কি গুণবতী বলে মনে হচ্ছে না ?"

ভগিনীপতির দিকে ফিরিয়া চাহিয়া অনিল বলিল, "বরং ঠিক তার বিপরীত। এমন চমৎকার চেহারার মেয়ে আমি কমই দেখেছি, এমন কণ্ঠস্বর শুনিই নি। ইনি যার গৃহলক্ষ্মী হবেন, সে ভাগ্যবান সন্দেহ নাই।"

প্রতুলচন্দ্র মনে মনে একটু আশান্বিত হইলেন। একদিনে বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয় মনে করিয়া তিনিও প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

এমন সময় বীরেশবাবু আসিয়া বলিলেন, "এইবার ভিতরে চলুন আপনারা—সব প্রস্তুত।"

তের

মণীশ অন্যমনে কি ভাবিতেছিল। তাহার চিত্রাঙ্কন-কক্ষের গবাক্ষের মধ্য দিয়া সূর্য্যকরোজ্জ্বলা ধরিত্রীর রূপরসস্পর্শশব্দগন্ধ তাহার রসানুভূতির সূক্ষ্ম তারে তখন কি সাড়া জাগাইতেছিল, চিত্রশিল্পী ব্যতীত তাহা কে বলিতে পারে ?

তাহার ভাবপ্রবণ অন্তরের অন্তস্তলে তখন কি যেন কি একটা অভাবের ব্যথা গুমরিয়া উঠিতেছিল। যেন তাহার সমস্ত সম্পদবিভবের মধ্যে কোথায় কি একটা ফাঁক পড়িয়া রহিয়াছে, যেন কি একটা কত দূরদূরা-ন্তরের অতীত স্মৃতি কণ্টকের মত মনের মধ্যে খচখচ করিতেছে। কি সেই অভাব, কি সেই ব্যথা ?

ভাবিতে গেলেই তাহার সমস্ত প্রাণটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে কেন ? পরস্ত্রী ? ছিঃ, ছিঃ সে ত এখন পরের ঘরণী, অপরের সংসারের সুখশান্তি দায়িনী সর্ব্বময়ী গৃহিণী,—তাহার স্মৃতির সহিত তাহার সম্পর্ক কি ?

কিন্তু—কিন্তু—মনের নিভৃত কোণে অতিসঙ্গোপনে যদি সে তাহার মানস্ প্রতিমাকে শত পুষ্পে সাজাইয়া অন্তরের প্রীতিশ্রদ্ধা নিবেদন করে—কেহ জানিবে না, কেহ দেখিবে না, কেহ অনুযোগ করিবে না—তবুও কি সে জগতের দৃষ্টিতে অপরাধী ? সুদূর আকাশের নক্ষত্রখচিতা মধুময়ী যামিনী,—সেও ত দূর হইতে ভক্তপ্রিয়ের হৃদয়ের প্রীতিশ্রদ্ধার অঞ্জলি পায়, পায় কিন্তু জানিতে পারে না,—সে গোপন পূজায় কি পূজারী অপরাধী ?

চিরন্তনীর জয়

না, না, মহাপাপ! পরস্ত্রীর চিন্তাও মহাপাপ! সে পাপের বিষবায়ুতে জগৎ সংসার জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হয়। গোপনে পূজা, গোপনে শ্রদ্ধাপ্রীতির অঞ্জলি দান,—সেও ত আত্মতৃপ্তির, আত্মসুখের জন্য। সেও কি মহাপাপ নহে? জগৎ সংসার জানিতে পারিল না, কিন্তু আমি ত জানিতেছি! মনের কাছে কোন্ পাপ গোপন থাকে? আর সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান অন্তর্য্যামী? না, না,—চিন্তাতেও পাপ, মহাপাপ!

"দাদাবাবু শিগ্‌গীর এসো, সাধুচরণ বাবু এসেছে, ডাকতিছে তোমাকে—"

বিশ্বস্ত বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে মণীশ চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল,—চোর চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলে যেমন করে, মণীশেরও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কে এসেছে নিলুদা? সাধু বাবু? কেন? এমন অসময়ে ঠিক দুপুর রোদে?"

নীলমণি বলিল, "তা ত বলতি পারতিছি নি দাদাবাবু। বল্‌লে বড় জরুরী—তুমি আসতি থাকো দাদাবাবু, আমি তেনারে বাইরির ঘরে বসাই গিয়ে।"

নীলমণি একরূপ ছুটিয়া চলিয়া গেল, মণীশও গবাক্ষটি রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার অনুসরণ করিল। যাইতে যাইতে সে কেবল একবার অস্ফুটস্বরে আপন মনে বলিল,—সাধুচরণ বাবু? নারী আশ্রয় সমিতির সেক্রেটারী? এই দিবা দ্বিপ্রহরে তাঁর কি এমন বিশেষ প্রয়োজন?

বাহিরের বসিবার কক্ষে পদার্পণ করিয়া মণীশ দেখিল, ভদ্রলোকটি অস্থিরভাবে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। মণীশের পদশব্দ শ্রবণে তিনি দ্রুতপদে তাহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া আপন করপুটে মণীশের দুইটি কর আবদ্ধ করিয়া আকুল অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে

বলিলেন, "মণীশবাবু, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! আপনি এর আগে অনেকবার আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন,—"

মণীশ ভদ্রলোককে আসনের দিকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "বসুন, সাধু বাবু, বসুন, আগে স্থির হন।"

ভদ্রলোকটি রুদ্ধক্রন্দনের স্বরে বলিলেন, "স্থির হবো? কেমন করে বলুন ত? আমার পুণ্যের সংসারে পাপ ঢুকেছে, আমায় স্থির হতে বলছেন?"

মণীশ বলিল, "বসুন, সাধু বাবু। কি হয়েছে বলুন?"

সাধু বাবু কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "জানেন ত মণীশ বাবু, আমাদের এ পাড়ার নারী আশ্রয় সমিতিতে আজ মাসখানেক আগে অমলা বলে একটি মেয়েকে রেখে গিয়েছিল —"

মণীশ বলিল, "হাঁ শুনেছিলাম বটে আপনার কাছে। সেই ত যে মেয়েটির বাপ মা নেই, মামার কাছে মানুষ হচ্ছিল, তার বিয়ে থাও হয়ে গিয়েছিল। তার পর মামার বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, ধরে এনে এখানে রেখে গিয়েছিল—"

সাধু বাবু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সেই মেয়ের কথাই বলছি। উঃ কাল সাপ এনে পুষেছিলুম মশাই! হতভাগা মেয়েটা নিজে ত উচ্ছন্ন গেছেই, সঙ্গে সঙ্গে আমার আশ্রম থেকে আর দুটো মেয়েকে ফুসলিয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে গেছে। উঃ আমি কি করবো—আশ্রমের এ বদনাম নিয়ে কি করে কাজ চালাবো বলুন দিকি! কাল সাপ মরলি মরলি, নিজে মরলি নি কেন? উঃ আপনি আমায় বাঁচান মণীশ বাবু, আমায় বাঁচান। জানেন ত আমার আশ্রমের সুনামই আমার সব চেয়ে বড় পুঁজি!"

মণীশ বলিল, "কি হয়েছিল ব্যাপারটা বলুন দিকি।"

সাধু বাবু বলিলেন, "ওটার স্বভাব ছিল খুব ভাল, খুব ভাল মানুষ ছিল। কিন্তু ওদের পাড়ায় ওর বিয়ের এক বছর আগে ওর মামার এক খুড়তুতো ভাই এসে বাস করে। ছিল তারা পশ্চিমে, বদলী হয়ে এখানে আসে, রেলে কাজ করতো। তার একটা ছেলে ওদের বাড়ী হামেশা যাওয়াআসা করতো। মামাতো পিসতুতো ভাই বোন, তাই ওদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হাসিতামাসাও চলতো—এতে ত কোন সন্দেহ হবার কথা নেই।"

মণীশ সবিস্ময়ে বলিল, "এত নিকট সম্বন্ধ? এ ত আপন মার পেটের ভাই বোনের মত।"

সাধু বাবু বলিলেন, "হাঁ তাই বটে! আর কি সে সব রক্তর বাচ-বিচার আছে মণীশ বাবু! তার পরে ঐ ছোঁড়াটা ওর পাছু লেগে শেষকালে ওকে খারাপ করে ফেললে। শেষে কি না সর্ব্বনাশী স্বামীর ঘর করতে চাইলে না, শ্বশুরবাড়ী যাবার নাম শুনে পালিয়ে গেল মামীর গয়নাগাটি চুরি করে নিয়ে! কিন্তু যত নষ্টের গোড়া ঐ হারামজাদা ছোঁড়াটা! ভদ্দর লোকের ছেলে এমন হয়? সম্বন্ধের বাচ-বিচার নাই করলি, তা বলে পরের স্ত্রী, পরের ঘরের বউ—তার চিন্তা করলেও যে মহাপাপ! ছিঃ ছিঃ!"

মণীশের হৃদপিণ্ডটা দ্রুত স্পন্দিত হইয়া যেন একবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, পাংশুবর্ণ মুখে সে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না।

"দাদাবাবু, নাতি খেতি হবে না? চল, চল, বেলা অপোগণ্ড হয়ে আসতি নাগ্‌লো—মা জননী হেঁসেল আগুলচেন বসে বসে।"

মণীশ নীলমণির আগমনে যেন অকুলে কূল পাইল। হাঁপ ছাড়িয়া বলিল; "হাঁ, চল যাই নীলুদা, তুমি ততক্ষণ তেল গামছা রেখে এস গিয়ে।

হাঁ, দেখুন সাধু বাবু, এ বিষয়ে আমার কাছে যা সাহায্য চাইবেন, তাই কোরবো।"

সাধু চরণ বাবু পুনরায় মণীশের হাত দুইটি নিজ করপুটে গ্রহণ করিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন, "চিরকাল ত তাই করে আসছেন মণীবাবু। এ পাড়ার আপদে বিপদে আপনিই ত ভরসা। আপনি একবারটি চলুন আমাকে নিয়ে রায় সাহেব জগদীশ বাবুর কাছে—"

"কে, ডিপুটি কমিশনার জগদীশ বাবু? তা চলুন—কিন্তু এখন কি তাঁকে পাওয়া যাবে অফিষে?"

"নিশ্চয়ই। এই সময়েই ত থাকেন। টিফিনের পর গেলেই হবে। ততক্ষণ আপনি নেয়ে খেয়ে নিন মণীশবাবু, আমিও দুটো মুখে দিয়ে আসি।"

মণীশ বলিল, "তা, আশ্রম থেকে কি করে পালালো? সেই ছেলেটা সঙ্গে ছিল নাকি?"

সাধুবাবু বলিলেন, "কে জানে মশাই, হারামজাদাটা কোথায় ছিল তখন। তবে আশ্রমের দরোয়ান বলেছে, পাশের মাঠটাতে ঐ বেটাকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে সে তিন চার দিন। আপনি তৈরী হয়ে থাকুন; যাবার সময় গাড়ীতে আপনাকে সব বলব'খন।"

সাধুচরণবাবু নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মণীশের মুখমণ্ডল গম্ভীর, ললাট চিন্তা-রেখাগ্রস্ত, মনের মধ্যে তখন তাহার ঝড় বহিতেছে। সত্যই ত পরস্ত্রী মাতৃসমা—ইহাই ত তাহার আবাল্যের শিক্ষা! আর আজ?

হে সর্ব্বশক্তিমান! হে সর্ব্বান্তর্য্যামি! বলিয়া দাও, কোন পথে গেলে সে স্মৃতির মর্ম্মন্তুদ জ্বালার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে—কি করিলে নারীমাত্রকেই মাতৃসমা জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইবে!

MOHEANY PUBLIC LIBRARY
Estd. 1986

চৌদ্দ

সেদিন ঘনঘটা করিয়া মেঘমালা শূন্যে শূন্যে দৈত্যের ন্যায় বিরাট দেহ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। ছিদ্রশূন্য মেঘ—মৃদু বারিপাতের বিরাম নাই। ঝটিকার গর্জ্জন আর বিদ্যুতের দীপ্তি প্রথম প্রহর রাত্রিতে বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। হেমন্ত ঋতুর প্রথম পাদে বাঙ্গালা দেশে প্রায় প্রতি বৎসরই ঝটিকার আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা আবহবিদ্যাবিদগণ বলিয়া থাকেন।

নির্জ্জন কক্ষে, অনিলচন্দ্র রাত্রির আহার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। আজ কলেজ বন্ধ ছিল বলিয়া সমস্ত দিন সে নিয়মিত সূতা কাটার পর গ্রন্থপাঠেই অতিবাহিত করিয়াছে। এখন আর পাঠে তাহার স্পৃহা ছিল না। জানালা খুলিয়া দিয়া প্রকৃতির রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির দিকে সে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া রহিল। প্রকৃতির অশান্ত রূপ তাহার কাছে কখনও প্রচণ্ড বলিয়া মনে হয় না। এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও সে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র রূপ ও লীলা দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠে। সে শান্ত নিয়মশৃঙ্খলার ভক্ত হইলেও মাঝে মাঝে প্রকৃতির উদ্দাম খেয়াল দেখিয়া তাহার মধ্য হইতে সে সৌন্দর্য্য-লীলার ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

আজও তরুণ অধ্যাপক প্রকৃতির এই সংহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যলীলার ছন্দ অনুভব করিতে

লাগিল। না, বিশৃঙ্খলতা বিশ্বসৃষ্টিতে নাই, থাকিতে পারে না। নিয়ম অমোঘ, অপ্রতিহত গতিতে জড় ও চেতন জগতে বিদ্যমান। উন্মদগতিতে মেঘমালা ছুটিতেছে,—আকাশের বক্ষ চিরিয়া সুন্দরীর নিষ্ঠুর হাস্যজ্বালার মত যে প্রদীপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহাতেও একটা শৃঙ্খলা আছে। মানুষের মনও কি প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে?

অনিলচন্দ্র চিন্তাজগতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। মানব-মনের বিচিত্র ও বিশিষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও একের সহিত অপর মনের সূক্ষ্ম সাদৃশ্য কোথায়—সে সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণ কোথায় কি বলিয়াছেন, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় সে তন্ময় হইয়া গেল। বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও যে চিরন্তন সত্য মানবজীবনে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে ভুল করিয়া বুঝিলে চলিবে কেন?

মানুষের মন সুখ চাহে, আনন্দ প্রার্থনা করে—শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা সংসারী মানবমাত্রেরই কি একান্ত প্রার্থনার বস্তু নহে? নিশ্চয়ই। কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? তবে?

অনিলচন্দ্র মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। এমন প্রশ্ন সহসা তাহার অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিল কেন? চিন্তার কোন্ সূত্র ধরিয়া মন এমন প্রশ্ন উত্থাপিত করিল? ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কোঠায় আসিয়া মন এমন ভাবে বিচারের আলোচনায় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ইহার হেতু কি?

অন্তরের মধ্যে দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া সে দেখিল, বাহিরের এই দুর্য্যোগময়ী রজনীর মত সেখানেও প্রলয় ঝটিকার সূচনা হইয়াছে। মেঘ জমিয়া বিদ্যুৎদীপ্তি ও বজ্রগর্জ্জনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা কি শুধুই খেয়াল, না নিয়মতান্ত্রিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল?

বিগত জীবনের কার্য্যধারা এবং মনোবৃত্তির হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া সে দেখিল, অসঙ্গতভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত সে কোন কাজই

করে নাই। কোন কোন কার্য্যের দ্বারা সে পিতা মাতার মনে দুঃখ দিয়াছে, নিজেও সেজন্য হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছে সত্য; কিন্তু সে সকল ব্যাপারে তাহার কোন হাতই ছিল না। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত কি অস্বীকার করিতে পারে?

ঝটিকার প্রচণ্ড গর্জ্জন চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে প্রবল ধারায় বারিপাতও হইতেছিল। অনিলচন্দ্রের দার্শনিক চিত্ত প্রকৃতির এই রণ-রঙ্গিণী নৃত্যলীলার মধ্যে যে বিচিত্র মাধুর্য্য অনুভব করিতেছিল, তাহাতে সহসা তাহার চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িল।

কিন্তু আজ এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, একা একা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। কাহারও সহিত এই সৌন্দর্য্যানুভূতির রস ভাগ করিয়া লইতে পারিলে বোধ হয় একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

মনের মধ্যে এই চিন্তা সমুদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেশবাবুর কন্যার উদ্যানপথবর্ত্তিনী মূর্ত্তি তাহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাহার পরিপূর্ণকণ্ঠের সঙ্গীতধারার স্মৃতি তাহার মনে আজিকার এই বাদলধারার ছন্দে যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিল!

অনিলচন্দ্রের মন কয়েক মুহূর্ত্ত সেই স্মৃতির তরঙ্গদোলায় দোল খাইয়া সহসা যেন প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার দার্শনিক চিত্ত মনের গতিবেগ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখিল, তাহা ত স্বাভাবিক অবস্থায় নাই।

বাতায়ন সন্নিধান হইতে উঠিয়া অনিলচন্দ্র গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। এই গৌরী তন্বঙ্গী, সুদর্শনা, সুকেশা—এক কথায় সে সুন্দরী। জনশ্রুতি বলে শুধু সুন্দরী নহে, গুণবতী—শিক্ষিতা!

কক্ষমধ্যস্থলে সহসা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া অনিলচন্দ্র গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

কোনও নারী সম্বন্ধে সে এমনভাবে কখনও ত মনের মধ্যে আলোচনা করে নাই! সে নারী-বিদ্বেষী কোন দিনই নহে, নারীসঙ্গ পুরুষ-জীবনকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলে, ইহা ত সে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে। কিন্তু জীবনের পঁচিশটি বসন্ত তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া বিষণ্ন মনে ফিরিয়া গিয়াছে, ইহাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সে সৌন্দর্য্যের উপাসক, তত্ত্বরসের ভক্ত। তাহার সমগ্র জীবন, শিক্ষা, সবই ত এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অনুশীলনে নিযুক্ত। মহিমময়ী নারীকে বাদ দিয়া কি সৌন্দর্য্যানুশীলন সম্পন্ন হইতে পারে? তথাপি সে এখনও পর্য্যন্ত কোনও নারীকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করে নাই কেন?

আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের দীপ্তশিখা হাসিয়া উঠিল।

অনিলচন্দ্র মনে করিল, উহা নারীরই বিদ্রূপজ্বালা। তাহার চিন্তা-ধারাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন উহা আকাশপটে মুহূর্ত্তের জন্য দীর্ঘ রেখা আঁকিয়া দিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই ভীমগর্জ্জনে সমগ্র বাড়ীখানি কম্পিত হইয়া উঠিল।

দূর অতীতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হইল। কিশোর জীবনের অনাবিল বন্ধুত্ব—প্রাণের আশা ও আনন্দের রঙ্গীন চিত্রগুলি স্মৃতির পটে ধীরে ধীরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সরলহৃদয়ের রিপুকলঙ্কবর্জ্জিত নির্ম্মল মনোভাবগুলি কল্পনার ললিত তুলিকার সঞ্জীবনস্পর্শে বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রথম যৌবনে তাহার গতিবেগ স্বচ্ছন্দ ও প্রবল।

কিন্তু প্রবাহধারায় সহসা বাধা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। অদৃষ্টের নির্ম্মম বাহু বিরাট লৌহপ্রাচীর তুলিয়া সে গতিবেগের প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দিল। তরুণ হৃদয়ের সে নৈরাশ্য সে জীবনে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। গভীর সহানুভূতিতে তাহার সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অলক্ষ্য

দেবতার চরণোদ্দেশে গভীর নতি জানাইয়া সে কি অঙ্গীকার করে নাই, যতদিন—যে পর্য্যন্ত ব্যথিত, নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে আশা ও আনন্দের আলোক জ্বলিয়া না উঠে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই? ততদিন সাংসারিক জীবের প্রার্থনীয় মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু হইতে সে আপনাকে দূরে নির্ব্বাসিত রাখিবে?

ঝটিকার তরঙ্গ কক্ষমধ্যে উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিল। গৃহের আলোক আত্মরক্ষার ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া অন্ধকারে আত্মবিসর্জ্জন করিল।

অনিলচন্দ্র আলো জ্বালিবার কোন চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে আবার অন্য দিকের খোলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

দ্রুততর বেগে, উন্মত্তভাবে মেঘের পর মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে, ঘনান্ধকারেও তাহা অনিলের দৃষ্টি এড়াইল না।

বুকের উপর বাম হস্ত স্থাপন করিয়া শূন্য নয়নে অনিলচন্দ্র মহাশূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার সে দিনের সে অঙ্গীকার, সে প্রতিজ্ঞার কথা কোন মানুষই শুনে নাই; কিন্তু সকলের অন্তর্য্যামী চিরসুন্দর কি সেদিন আশীর্ব্বাদ ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে বলিয়া উঠেন নাই—"তথাস্তু"?

না, তাহার ব্রত এখনও অনুদ্‌যাপিত, তাহার কর্ম্ম অসম্পূর্ণ। আত্মতৃপ্তি, আত্মসুখ ভোগ করিবার ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার এখনও তাহার হয় নাই।

কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার অধিকারও তাহার নাই। লৌকিক জীবনে তাহার এ মনোবৃত্তির কোনও মর্য্যাদা হয় ত না-ই। তাহার এমন সঙ্কল্প সাধারণ মানুষের কাছে উদ্ভট, হাস্যোদ্দীপক বলিয়া উপেক্ষিত হই'

ঝটিকার তরঙ্গে সে কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, দূর হইতে যেন গানের সুরে ধ্বনিত হইতেছে—

"বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি,—

সত্য, অতি সত্য। মানব-জীবনের এই অনতিক্রমনীয় সত্যকে সেদিন তরুণীর কণ্ঠে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে সে দেখিয়াছে। তাহার অতীত ও বর্ত্তমান সেই সত্যকে বহন করিয়া অনুক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে না কি ?

অনিলচন্দ্র স্তব্ধভাবে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রজনীতে তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দ ব্রহ্ম, সুর তাহার মূর্ত্ত্য প্রকাশ। সুর যে প্রেম ও আনন্দের রাসলীলার অভিনয় করে, মানুষের মানসে তাহার অনুভূতি মানুষকে এ মর জগতের বহু উচ্চে ব্রহ্মলোকেই উপনীত করিয়া দেয়। তখন মানুষ যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অনুভূতির রসাস্বাদন করে, তাহাই তাহাকে কি তাহার মানসী আদর্শ প্রতিমার সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দেয় না ? অনিলচন্দ্রের মানস সমুদ্রে তখন যে তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল, সে কি তাহাতে পাড়ি দিয়া পরপারে নিরাপদ বন্দরে উপনীত হইতে পারিবে ? একদিকে বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য পালন, অন্যদিকে মানসী প্রতিমার আকর্ষণ, মানুষ সে, রক্ত-মাংসের শরীর তাহার, এ ভীষণ পরীক্ষায় সে কিরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে,—কে সর্ব্বশক্তিমান তাহার অন্তরে বিরাজ করিয়া সে সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে ?

পনেরো

ম্যাজিষ্ট্রেট-গৃহিণী সমাদরে অনিলচন্দ্রকে কাছে বসাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তার পর, সকালবেলা কি মনে করে, মিঃ বোস্?"

অনিলচন্দ্র বলিল, "আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে আপনাকে।"

মিসেস্ টমসন্ সহাস্যে বলিলেন, "আপনাকে সাহায্য করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কারণ আমি জানি আপনি নিজের জন্য কোন কিছু করেন না। আর যা কিছু করেন, তাতে কোন অন্যায়ের সংস্রব নেই।"

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া অনিলচন্দ্র বলিল, "আমার সম্বন্ধে আপনার এমন উচ্চ ধারণার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু মিসেস্ টমসন্, আপনি এমন ভাবে আমায় লজ্জা দিলে কোন কথা বলাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না।"

প্রৌঢ়া ইংরাজ মহিলা অনিলচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "অনিল, তোমার মত বয়সের একটি ছেলে আমি হারিয়েছি। সে যদি তোমার মত মনোবৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাকত, আমার বুক মাতৃগর্ব্বে ভরে উঠ্‌ত। তোমার সম্বন্ধে সহরের পদস্থ ভদ্র লোকদের উচ্চ ধারণার কথা তুমি হয় ত জান না। তোমার গুণের প্রশংসায় মিঃ টমসন্ পঞ্চমুখ, সুতরাং লজ্জার কোন কারণই তোমার নেই।"

কথার মোড় ঘুরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে অনিলচন্দ্র বলিল, "যে জন্য আজ আপনার কাছে এসেছি, সে কথা নিবেদন কর্ত্তে পারি কি?"

"অনায়াসে, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই করতে প্রস্তুত।"

অনিলচন্দ্র তখন তাহার বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইয়া দিল। সহরে আগামী শীতঋতুতে একটি স্বদেশী শিল্পমেলা বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের কুটীর শিল্প, কৃষিজ পণ্য, দেশীয় ললিতকলার নিদর্শনসমূহ লইয়াই মেলার প্রতিষ্ঠা হইবে। কর্ম্মের দিক দিয়া, চিন্তার অনুশীলনে বাঙ্গালী কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এ অঞ্চলের নরনারীর সম্মুখে যদি তাহা ধরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উৎসাহ পাইয়া অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়া ইহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর। মিসেস্ টমসনের চিত্র-বিদ্যার বিশেষ খ্যাতি আছে। ইংলণ্ডের চিত্রশালায় তাঁহার অঙ্কিত একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যদি মেলার চিত্রকলা বিভাগের প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মেলার অনুষ্ঠাতৃবর্গ কৃতার্থ হইবেন। মিঃ টমসন্ মেলার উদ্বোধন করিবেন এবং যাহাতে বাঙ্গালীর এই জাতীয় শিল্পপ্রচেষ্টা স্বদেশী মেলা সার্থক হয়, সে বিষয়েও তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। মিসেস্ টমসন্ বলিলেন, "মিঃ টমসনের কাছে এ খবর আমি আগেই পেয়েছি। তোমাদের এ প্রচেষ্টা সাধু। কিন্তু অনিল, এ শিল্প মেলা প্রতিষ্ঠার মূল গায়েন কে? আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, এ কল্পনা প্রথম তোমার মনেই উঠেছিল।"

সলজ্জকণ্ঠে অনিল বলিল, "না, মিসেস্ টমসন্, এর জন্য আমাকে প্রশংসা দেবেন না। এর প্রথম প্রেরণার জন্য একটি তরুণী বাঙ্গালী মেয়েই সকল প্রশংসার অধিকারিণী। আমি ঘটনাক্রমে সেই কথাটা জান্‌তে পেরে সকলের কাছে প্রস্তাব করেছি। সহরের গণ্যমান্য সকলেই অবশ্য উৎসাহ ও অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়েছেন।"

মিসেস্ টমসন্ বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "বটে ! সে মেয়েটি কে ?"

অনিল বলিল, "কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক বীরেশবাবুকে বোধ হয় আপনি জানেন। তাঁরই মেয়ে গৌরী একদিন কথায় কথায় আমার বোনএর কাছে বলেন, সারা বাঙ্গালায় কত কি হচ্ছে, আমাদের এখানে এমন একটা শিল্প মেলা বসালে মন্দ হয় কি ? দেশের মেয়েরাও নিশ্চিন্ত বসে নেই—তাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে পারলে অনেক কাজ বোধ হয় হতে পারে। সেই কথা শুনে—"

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিছু মনে কোরো না। মেয়েটি কি বিবাহিতা ?"

মিসেস্ টম্সনের প্রশ্নে, কৌতুকভরা স্নেহদৃষ্টির আঘাতে অনিল ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি নত করিল। তাহার আনন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "না, মিসেস্ টমসন্! তাঁর এখনও বিয়ে হয় নি। সুপাত্রের অভাবে বীরেশবাবু এখনও তাঁকে ঘরে রাখতে বাধ্য হয়েছেন।"

"তুমিও এখন কুমার অবস্থায় আছ ? হ্যাঁ, আমি তাই শুনেছি। এ কথা ঠিক ?"

অনিল পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনার সংবাদ সত্য। কিন্তু—"

সহসা সে থামিয়া গেল। সে এ সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিল না।

মিসেস্ টম্সন্ তখনও তেমনই সহাস্য আননে, প্রসন্ন দৃষ্টিতে অনিলের দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বীরেশবাবুর কথা আমি শুনেছি, তিনি যেমন পণ্ডিত, তেম্নি ধর্ম্মপ্রাণ। তোমার ভগিনীপতি প্রতুলের কাছে শুনেছি, তাঁর মেয়েটি অতি চমৎকার। আমি কত খুব সুখী হব, অনিল, ভারী তৃপ্তি পাব।"

অনিলের অন্তর-দেশ এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়া ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বোধ হয় ভিতরের কম্পনবেগ বাহিরেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে। সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বোধ হয় আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতেছিল।

দৃঢ়বলে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সংযত কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাদের প্রার্থনার অনুমোদন করলেন ত, মিসেস্ টম্‌সন্ ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। শুধু তাই নয়, তোমাদের মেলা ভাণ্ডারে আমি যৎসামান্য—হাজার টাকা দিতে চাই।"

উৎসাহভরে অনিল বলিল, "এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার মহত্ত্ব ও স্নেহকে বিচার করতে চাই না, মা! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন!"

অনিলের নয়ন-যুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। সে জানিত, এই দয়ামতী মহিলা নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী, ধনী পিতার কন্যা। কিন্তু তাঁহার অন্তর এ-দেশীয়দিগের কল্যাণ-কল্পে এমন উন্মুক্ত, তাহা সে পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই!

সে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীমতী টম্‌সন্ হাসিয়া বলিলেন, "এই স্বদেশী মেলায়, অনিল বসুর খদ্দরের সূতোর তাঁতের কাপড় দেখ্‌তে পাব ত?"

অনিল মাথা নত করিয়া বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে এই পুণ্য-মন্দিরে আমার সামান্য অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হবার চেষ্টা করব।"

মিসেস্ টম্‌সন্ বলিলেন, "তোমায় এ জন্যও আমি ভালবাসি, অনিল।"

অনিল নতশিরে অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ষোল

পূজার ছুটীর দীর্ঘ অবকাশে বীরেশবাবু স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হৈমবতীর বহুদিনের সাধ ছিল, তিনি বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ দেখিয়া আসিবেন। কন্যা গৌরীর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। বীরেশবাবুর কয়েকখানি গণিত পুস্তক শিক্ষাবিভাগের মনোনীত হওয়ায় তিনি উহা বিক্রয় করিয়া বিগত দুই বৎসরে কিছু মোটা টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কয়েক সহস্র টাকা, নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া, অতিরিক্ত অর্থ তিনি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবার পূজার অবকাশে গৃহিণীর চির-সঞ্চিত বাসনার তৃপ্তিসাধন তাঁহার একান্ত লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

পল্লীভূমি হইতে বাহির হইবার তাঁহার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতাতে তাঁহার কোনও আত্মীয় থাকিতেন। কন্যার জন্য দুই একটি পাত্রের সন্ধান তিনি দিয়াছিলেন। তীর্থ ভ্রমণ সারিয়া ফিরিবার পথে সে বিষয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজন হইলে মেয়ে দেখানর কাজ সারিয়াও যাইতে পারেন। অত্যন্ত প্রার্থিত পাত্র অনিলচন্দ্রের তরফ হইতে আকার ইঙ্গিতেও কোনও অনুকূল ভাব এ পর্য্যন্ত দেখিতে না পাইয়া কন্যার বিবাহকে আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে ফেলিয়া রাখিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

তাহা ছাড়া আগামী স্বদেশী মেলা উপলক্ষে ছুটীর পর তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। তিনিও উদ্যোক্তা-

দিগের অন্যতম। বিশেষতঃ অনিলচন্দ্র তাঁহার উপর এ বিষয়ে বিশেষরূপে নির্ভর করে বলিয়া অন্ততঃ মাসখানেক ধরিয়া দেশ ভ্রমণের দ্বারা মনের ও শরীরের গ্লানি দূর করিয়া আসিতে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন।

কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ দর্শন করিয়া বীরেশবাবু মথুরা ও বৃন্দাবনে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। সেখানকার দর্শনীয় যাবতীয় স্থান দর্শন করিয়া ভক্ত বীরেশবাবু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, তাই ভক্তজন-পূজিত রাধামাধবের লীলাভূমিতে কয় দিন যাপনের পর স্থির করিলেন, কিছু বেশী দিন আগ্রায় থাকিয়া মোগল-সম্রাটগণের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিবেন।

সম্রাট সাজাহানের গৌরব-স্তম্ভ তাজ দেখিবার আগ্রহ গৌরীর চিত্তকে সমধিক অভিভূত করিয়াছিল। বীরেশবাবুও পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীর এই অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়া ধন্য হন নাই—অথচ ইহার সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পর্য্যটকগণের কত বর্ণনাই না তিনি পাঠ করিয়াছেন !

ভদ্র বাঙ্গালীর বাসের উপযোগী হোটেলের অভাব আগ্রা সহরে নাই। বীরেশবাবু পরিবার সহ বাস করিবার উপযোগী এইরূপ একটি হোটেলের একাংশ ভাড়া করিলেন। পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যটিকে তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সহর ভ্রমণে বাহির হইলে ভৃত্যটি বাসায় প্রহরীর কার্য্য করিত।

আগ্রায় আসিবার পর প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি কয়দিন ধরিয়া তাঁহারা সম্রাট আকবর ও বহু উজীর ওমরাহের সমাধি ভবন দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। স্থাপত্য-শিল্পের এমন চমৎকার নিদর্শন দেখিয়া সকলেরই চিত্ত অভিভূত হইল! আগ্রা সহরে কোনও উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর নিকট তিনি পরিচয় পত্র আনিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের চেষ্টায় আগ্রা দুর্গ দেখিবার ছাড়পত্রও তাঁহার পক্ষে সংগ্রহ করা দুর্লভ হইল না।

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৌরী মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিল, "বাবা, এ যে একটা প্রকাণ্ড সহরের মতই বড়।"

পিতা বলিলেন, "তাই ত দেখ্‌ছি।"

মর্ম্মরপ্রস্তর রচিত দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস দেখিয়া গৌরী বলিল, "সম্রাটের দরবার এখানেই বস্‌ত, বাবা?"

"হ্যাঁ, মা।"

"কি চমৎকার শিল্পকাজ!"

বীরেশবাবু আনমনে বলিলেন, "তবু এখন ত কিছুই নেই। শুনেছি দামী পাথরগুলো সব খুলে নিয়ে গিয়েছে।"

ক্রমে তাঁহারা সম্রাট সাজাহান যেখানে বসিয়া প্রত্যহ তাজের শোভা দেখিতেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মোগল সম্রাটগণের আধিপত্যের যুগে দুর্গ-প্রাসাদে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিভূতি ছিল, এখন তাহা অন্তর্হিত হইলেও, অতীত গৌরবের স্মৃতি দর্শকগণের মনকে বিস্ময়রসে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

শিশমহলের কারুকার্য্য, সাজাহানের কারাকক্ষ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহারা সেদিনের মত বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

পরদিবস দিবাভাগে তাজের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গৌরী বলিল, "বাবা, শুনেছি, রাতে তাজের রূপের তুলনা নেই। চাঁদনি-রাতে একদিন তাজ না দেখে আমি কিন্তু আগ্রা ছাড়তে রাজি নই।"

বীরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। এই পূর্ণিমেতে আসা যাবে।"

গৌরী চলিতে চলিতে বলিল, "সে ত এখন দেরী আছে, বাবা। এর মধ্যে ফতেপুর সিক্রি দেখে এলে হয় না?"

গাইডকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, ফতেপুর সিক্রিতে আকবর সাহের লালপাথর নির্ম্মিত কেল্লা আছে। আগ্রার দুর্গ সেই আদর্শে নির্ম্মিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যাইতে পারেন। দেখিয়া তৃপ্তিলাভ অসম্ভব নহে।

পর দিবস সকাল সকাল আহার সারিয়া বীরেশবাবু সপরিবারে রেলে চড়িয়া ফতেপুর সিক্রি ষ্টেশনে নামিলেন। ক্ষুদ্র ষ্টেশন, যাত্রীর সংখ্যাও অধিক নহে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যালোকে তাঁহারা প্রথমতঃ সেলিমচিস্তি দেখিতে গেলেন। যে ফকীরের দৌলতে আকবর পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত সেই সমাধিক্ষেত্রে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। এই ফকিরের নামানুসারেই জাহাঙ্গীরের ডাক-নাম সেলিম হইয়াছিল। বন্ধ্যারা এখনও জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে, ফকিরের সমাধিক্ষেত্রে নানাবিধ স্মারক দ্রব্য ঝুলাইয়া রাখে।

গৌরী ইতিহাসে এ সকল কথা পড়িয়াছিল। তাহার অন্তর যে কোনও পবিত্র স্থানে আসিলেই ভক্তিতে নত হইয়া পড়িত। সে পরলোকগত মহাপুরুষের উদ্দেশে নমস্কার জানাইল।

পল্লীর শ্যামাঞ্চলে প্রতিপালিতা গৌরী পূর্ব্বে কখনও দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, বাধাবন্ধনহীন উদার আকাশ-তলে এমন করিয়া বাহির হয় নাই। প্রথম প্রথম যে সহজাত কুণ্ঠা তাহাকে পশ্চাতে আকর্ষণ করিত, মুক্ত বাতাসে, নানা দেশের আবহাওয়ায় কয় দিনের মধ্যে সে জড়তা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। এখন সে সকল ক্ষেত্রেই পুরোবর্ত্তিনী হইত। মাতা হৈমবতী সময়ে সময়ে তাহাকে বাধা দিতে গেলে বীরেশবাবু বলিয়া উঠিতেন, "যাক না, ওতে দোষ নেই ত। একটু সাহস হোক্। বাঙ্গালীর মেয়েরা কি চেলির পুঁটুলী হয়েই চিরদিন থাক্‌বে, না সেটা বাঞ্ছনীয়?"

হৈমবতী আর আপত্তি করিতেন না।

আজও সে সর্ব্বাগ্রে উচ্চ ভূমি অতিক্রম করিয়া পরিত্যক্ত বিরাট-দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। এক সময়ে সশস্ত্র দ্বারী প্রবেশ পথে দাঁড়াইয়া থাকিত,—সাধারণ ত দূরের কথা, পরিচিত ব্যক্তিকেও সন্তর্পণে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইত।

কথাটা গৌরীর মনে হইতেই সে দাঁড়াইয়া পড়িল। গাইড্ সহ পিতা ও মাতা অল্পক্ষণ মধ্যে তথায় আসিলেন।

গাইড্ দেখাইয়া দিল, এইখানে বীরবলের প্রাসাদ। অদূরে সম্রাট মহিষীর মহল। এইরূপ নানা স্থান দেখিতে দেখিতে সোপান-শ্রেণী বাহিয়া সকলে দুর্গের সমুচ্চ স্থানে উপনীত হইলেন।

ভারত-সম্রাট যে সকল কক্ষে বাস করিতেন, তাহার সম্মুখে কৃত্রিম পুষ্করিণী। একদিন এইখানে সুগন্ধি শীতল জলে সম্রাট-মহিষী ও পুর-কামিনীরা লীলাভরে জলক্রীড়া করিতেন। তাতার প্রহরিণীরা তখন ভীষণ আয়ুধে সজ্জিত হইয়া চারি দিকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তখন মণিমাণিক্য-খচিত আলোকিত কক্ষগুলির মধ্যে নৃত্য ও সঙ্গীতের যে তরঙ্গোচ্ছ্বাস উত্থিত হইত, এখনও কি তাহার রেশ গগনে-পবনে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে না!

স্নিগ্ধ বাতাস শরীর জুড়াইয়া দিয়া বহিয়া গেল।

গৌরী মুগ্ধচিত্তে ষোড়শ খৃষ্টাব্দের সেই অদৃশ্য চিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে করিতে একটি প্রস্তরাসনের উপর বসিয়া পড়িল।

সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর। একদিন এই প্রান্তরে সংগ্রাম সিংহ ও বাবরের মধ্যে বল-পরীক্ষা হইয়াছিল। ফতেপুরসিক্রির রণক্ষেত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া নাই কি?

অস্তগামী সূর্য্য প্রান্তর-পারে অদৃশ্য হইতেছিল। গৌরী নির্নিমেষ

নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি বিষয় পিতার নিকট সে যত্ন করিয়া শিখিয়াছিল। অধীত বিষয়গুলি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মানসিংহ, প্রতাপসিংহ, আকবর, বীরবল, যোধাবাই, নৌরোজা—হিন্দুর ব্যক্তিগত বীরত্ব অথবা দুর্ব্বলতা, মোগল জাতির পরাক্রম, রাজনীতিক প্রতিভার বিকাশ ও অবসান।

অঙ্ক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত পিতার কাছে ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং অধঃপতনের ক্রমবিকাশের অতীত কাহিনী সে যত্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গশিরে বসিয়া, নির্জ্জন অপরাহ্নে তাহার নারীহৃদয় ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, অদূরে তাহার জননী বসিয়া পাণের কৌটা খুলিয়া পাণ চর্ব্বণ করিতেছেন, পিতা নির্ব্বাক ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। গাইড্ আরও কিছুদূরে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে।

কন্যার পদশব্দে পিতা ফিরিয়া চাহিলেন। ম্লান সন্ধ্যালোকে দেখিলেন, তাঁহার গৌরী-মার নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া কন্যার পার্শ্বে আসিলেন।

গৌরী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বাবা, চল নেমে যাই—ভাল লাগ্ছে না।"

বোধ হয় একই চিন্তা পিতা ও পুত্রীকে অভিভূত করিয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "তাই চল, মা।"

গাইডের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনটি প্রাণী নির্ব্বাক ভাবে দুর্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। আকাশ-পথে তখন দ্বাদশীর চাঁদ দেখা যাইতেছিল।

[library stamp]

সতেরো

পরিপূর্ণ চন্দ্রের কিরণ-ধারায় রজনী অবগাহন করিতেছিল।

উদ্যান-তোরণের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া টঙ্গাওয়ালা বিনীত কণ্ঠে বলিল, "এখানে কতক্ষণ থাক্‌বেন, বাবু?"

ভাঙ্গা উর্দ্দুতে বীরেশ বাবু জানাইলেন, অন্ততঃ ঘণ্টা দুই তাঁহারা ত থাকিবেনই, কিছু বেশীও হইতে পারে। আগ্রায় আসিবার পর কয়দিন ধরিয়া এই টঙ্গাওয়ালা প্রত্যহ তাঁহাদিগকে বহন করিয়া দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাইয়া আসিতেছিল।

সেলাম করিয়া সে জানাইল, দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া সে তাঁহাদিগকে বাসায় লইয়া যাইবে। রাত্রির ভোজন ব্যাপারটা সে ইতিমধ্যে শেষ করিয়া আসিতে চাহে। যদি দুই দশ মিনিট বিলম্ব হয়, তাঁহাদের কোন চিন্তার কারণ নাই। বিপদের কোন প্রকার আশঙ্কা এখানে নাই। বাঙ্গালী বাবুরা, বিদেশী সাহেবরাও জ্যোৎস্নারাত্রিতে এখানে প্রায়ই বেড়াইতে আসেন। তবে এ বৎসর তেমন ভিড় নাই। যাহাই হউক, বাবুজী যেন চিন্তিত না হন, তাহার বাড়ী বেশী দূরে নহে। এই অঞ্চলেরই সে লোক। যথাসময়ে সে আসিবে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে যমুনা তাজের পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। জলতরঙ্গে জ্যোৎস্নাতরঙ্গ মিশিতেছিল। কালো জলে সে হিরণ্যদ্যুতি যেন শ্যাম-হৃদয়ে রাধার রূপজ্যোৎস্নার বিচিত্র বিকাশ!

মুগ্ধ হইয়া গৌরী কয়েক মুহূর্ত্ত সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিল তার পর কৌমুদীস্নাত তাজের শুভ্র মূর্ত্তির দিকে চাহিতেই সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কি বিচিত্র রূপ! সত্যই ত মর্ম্মর স্বপ্ন! সত্যই ত শিল্প-রস-রসিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছেন, মোগলরা টাইটানদের মত পরিকল্পনা করিত এবং মণিকারদের মত সাজাইত! কি অপরূপ রূপ সুধাংশুর অংশুধারা অজস্র রজতধারার মত সেই শ্বেত মর্ম্মরের সর্ব্ব অঙ্গে গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। কি শোভা! কি শোভা! শত শত কবি চন্দ্রালোকে তাজের যে বর্ণনা করিয়াছেন, সে সৌন্দর্য্য—সে বিচিত্র রূপ কি কাহারও লেখনীতে যথার্থ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে?

সাজাহানের জীবনব্যাপী প্রেমের স্বপ্নের এই মূর্ত্ত বিগ্রহটির তুলনা কোথায়?

অভিভূতভাবে তরুণী সেইখানে বসিয়া পড়িল। শিল্পী মানব ইহা গড়িয়াছে, সাম্রাজ্যের অতুল অর্থ বৈভব ইহার দেহের সৌন্দর্য্য-বিধানের উপকরণ অক্লান্ত ভাবে যোগাইয়াছে; কিন্তু মানবের শাশ্বত প্রেম ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করিলে, অনন্তযৌবনা তাজ যুগে যুগে নরনারীর মনে এমন ভাবে, অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরসের তরঙ্গ তুলিতে পারিত কি?

এমন অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে জীবন সার্থক করিবার জন্য আজ দর্শকের ভিড় না থাকায় নিস্তব্ধ রজনীর মৌন স্তুতি যেন অম্বরপথে বিনা বাধায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল।

হৈমবতী স্বামীর সহিত বিমুগ্ধ ভাবে উর্দ্ধনেত্রে তাজের উন্নত দেহের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। মনুষ্যের উচ্চারিত ভাষা পাছে এই গভীর সৌন্দর্য্যের ধ্যান ভঙ্গ করে, এ জন্য কেহই কোন কথা কহিলেন না।

এমন সময় দূরে সুবৃহৎ চত্বরের কোনও অদৃশ্য প্রান্ত হইতে মৃদু বংশীধ্বনি বাজিয়া উঠিল। অতি ধীরে প্রকৃতির মৌন স্তুতির

তালে তালে বাঁশী যেন লীলায়িত শব্দতরঙ্গে মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রকৃতির ভাষাহীন অশরীরী বন্দনার ছন্দে ছন্দে মানুষের ফুৎকারে প্রাণহীন বাঁশীর দেহরন্ধ্র হইতে যে বিচিত্র বন্দনাগীতি বাতাসে ভর করিয়া শূন্য পথে যাত্রা করিতেছিল, তাহার মাদকতা হৈমবতী, বীরেশ-চন্দ্র ও গৌরীর হৃদয়তন্ত্রীকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিল।

দণ্ডের পর দণ্ড এমনই ভাবে যেন মুহূর্ত্তের ন্যায় সরিয়া গেল। বাঁশীর ঝঙ্কার, যমুনার কলোচ্ছ্বাস, মৃদু বাতাসে বৃক্ষের সর্ সর্ শব্দ, যে ঐকাতান রচনা করিতেছিল, তাহার মাধুর্য্য শুধু উপভোগ্য,—বর্ণনীয় নহে।

কথাটা গৌরীর মনে সমুদিত হইবামাত্র সে একবার পিতামাতার দিকে চাহিয়া দেখিল। না, তাঁহারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছেন,—শুধু একা সে-ই অভিভূত হয় নাই।

বাঁশীর ঝঙ্কার ক্রমশঃ থামিয়া গেল।

বীরেশবাবু ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন।

না, আর রাত্রি করা সঙ্গত নহে। টঙ্গাওয়ালা এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াই উচিত।

"গৌরী মা, চল এখন ফিরি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৌরী মৃদু কণ্ঠে বলিল, "যেতে ইচ্ছে করে না, বাবা। এ দৃশ্য দেখে তৃপ্তির শেষ নেই।"

হৈমবতী বলিলেন, "সে কথা সত্যি; কিন্তু আর রাত করা উচিত নয়। দশটা বেজে গেল প্রায়।"

তাজের চত্বর হইতে নামিয়া একটু অগ্রসর হইতেই বীরেশবাবু দেখিলেন, অদূরে দুইজন লোক মন্থর গতিতে তাঁহাদের অগ্রে চলিয়াছে।

তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোনও দর্শকের অস্তিত্ব এতক্ষণ তাঁহাদের দৃষ্টির গোচর ছিল না। ইহারাও কি এতক্ষণ তাজের অনবদ্য মহিমায় অভিভূত হইয়া বসিয়া ছিল ?

দীর্ঘাকার লোক দুইটি ক্রমশঃ দ্রুত চলিয়া তাজের প্রবেশ তোরণ উত্তীর্ণ হইল। তাহার পরেই বৃক্ষবীথির অন্ধকারে আর তাহাদিগকে দেখা গেল না।

বীরেশচন্দ্র কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "একটু তাড়াতাড়ি এস ; বড় রাত হয়ে গেছে।"

তোরণ পার হইয়া আর কিছুদূর গেলেই গাড়ী পাওয়া যাইবে। বীরেশবাবু দ্রুত চলিতে চলিতে একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন—গাড়ী আসিয়াছে কি ?

ভাল বোঝা গেল না, নির্দ্দিষ্ট স্থান শূন্য বলিয়াই মনে হইল।

"বাবা !" গৌরীর শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইতেই চন্দ্রালোকে তিনি দেখিলেন, ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষবীথীর অন্তরাল হইতে পূর্ব্বদৃষ্ট দুইটি মূর্ত্তি তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

দৃঢ়হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া বীরেশবাবু ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলেন, "কে তোমরা ?"

সে কথার উত্তর না দিয়া একজন বলিয়া উঠিল, "তোফা ! বহুৎ বঢ়িয়া চিজ, দোস্ত !"

কন্যাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া বীরেশবাবু যষ্টি উদ্যত করিয়া বলিলেন, "হঠ্ যাও, বদমাস্ !"

অপর ব্যক্তি বাহু বিস্তৃত করিয়া ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে বলিল, "পাকড়ো, ছোড়ো মৎ !"

উভয়ের মুখ হইতেই সুরার উৎকট গন্ধ বাহির হইতেছিল।

হৈমবতীর কণ্ঠদেশ হইতে উত্থিত চীৎকার বাহির হইতে চাহিল না। গৌরীর আনন মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। বীরেশবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "পাজি, বদমাস্!"

কিন্তু তাঁহার উদ্যত যষ্টি কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই—সম্মুখের জোয়ান লোকটা তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং প্রবল আকর্ষণে কাড়িয়া লইতেই টাল সামলাইতে না পারিয়া তিনি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন।

শঙ্কিতা বেপথুমতী নারীযুগল বীরেশ বাবুকে তুলিতে যাইবে, এমন সময় হৈমবতীকে সরাইয়া দিয়া জোয়ান লোকটা গৌরীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "মেরি পি—বাপ্—" সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া লোকটা তিন চারি হাত দূরে পড়িয়া গেল।

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিতেই গৌরী দেখিতে পাইল, দীর্ঘাকার এক যুবা দ্বিতীয় ব্যক্তির কণ্ঠদেশ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া নিপীড়িত করিতে করিতে বলিতেছে, "কুত্তাকা বাচ্ছা, হারামজাদ, শয়তান!"

তারপর ভীম পদাঘাতে তাহার শিথিল-প্রায় দেহকে ভূতল-শায়িত করিয়া যুবক স্নিগ্ধ কণ্ঠে হৈমবতীকে বলিল, "ভয় নেই মা, আপনারা আসুন।"

প্রথম জোয়ানটা ততক্ষণ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যষ্টি উদ্যত করিতেই যুবক ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইল। তারপর তাহার মুখমণ্ডলে উপর্য্যুপরি কয়েকটি প্রচণ্ড ঘুষি মারিতেই লোকটা নির্জ্জীবের মত মাটীতে পড়িয়া গেল।

বীরেশবাবু কম্পিত দেহে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

যুবক বলিল, "আপনারা শিগ্‌গীর এগিয়ে চলুন, আমি পেছনে আছি, আপনাদের কোন ভয় নেই।"

স্ত্রী ও কন্যার হাত ধরিয়া বীরেশবাবু বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবকও মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বীরেশচন্দ্র টঙ্গা দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ দেখিতেছেন, এমন সময় যুবক বলিল, "আপনাদের সঙ্গে গাড়ী ছিল না?"

তখনও বীরেশ বাবুর হৃদ্‌স্পন্দন থামে নাই। তিনি স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন, "লোকটা গাড়ী নিয়ে আস্‌বে বলেছিল; কিন্তু তাকে ত দেখ্‌ছি না।"

"আচ্ছা, আমার সঙ্গে মোটর আছে। চলুন আপমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে অগ্রসর হইল। অদূরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একখানি মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। সে উহার দ্বার খুলিয়া বিনম্র কণ্ঠে বলিল, "আপনারা উঠুন।"

হৈমবতী ও গৌরী অগ্রে উঠিলে, বীরেশবাবু ভিতরে গিয়া বসিলেন।

যুবক ক্ষিপ্রহস্তে সম্মুখের আসনের দ্বার খুলিয়া বাম পকেট হইতে চাবি লইয়া যন্ত্রে পাক্ দিল। কল টিপিতেই আলো জ্বলিয়া উঠিল। ষ্টিয়ারিং চাকায় হাত রাখিয়া সে দক্ষিণ হস্ত পাঞ্জাবীর পকেটে রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "যাঃ!"

বীরেশ বলিলেন, "কি হল?"

স্মিতকণ্ঠে যুবক বলিল, "ও কিছু না—বাঁশীটা ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় পড়ে গেছে দেখ্‌ছি।"

গৌরী পিতার মুখের দিকে চাহিল। বীরেশ বাবু বুঝিলেন যে, এই

যুবকই তাজের সন্নিধানে বসিয়া বাঁশীতে উহার বন্দনা-গীতি ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল।

গাড়ীর মধ্য হইতে একটা মোটা বংশযষ্টি বাহির করিয়া যুবক বলিল, "আপনাদের একটু দেরী হবে—দু'মিনিট। আমি বাঁশীটা খুঁজে নিয়ে আসি। ওটা আমার বড় সখের জিনিষ।"

হৈমবতী লজ্জা ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা। তুমি আর যেও না।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "কোন ভয় নেই, মা। ও রকম দু' পাচ জনকে আমি গ্রাহ্য করি না। এ গাছা হাতে থাক্‌লে অমন দশ জন লোক আমার কাছে এগুতে সাহস্ করবে না, মা। আমি এলাম বলে।"

বীরেশ বলিলেন, "আপনার সখের জিনিষ! কিন্তু না গেলেই ভাল হত।"

দ্রুতপদে চলিতে চলিতে যুবক বলিল, "কোন চিন্তা করবেন না।"

দুই মিনিটের মধ্যেই যুবক বাঁশী হস্তে ফিরিয়া আসিল। তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল, "লোক দু'টোকে দেখ্‌লাম না। বোধ হয় ওদিকের পাঁচিল টপ্‌কে সরে পড়েছে। ভয় ত আছে। একটু আগেই পুলিস থানা।"

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া যুবক উঠিয়া বসিল। তার পর বলিল, "আপনাদের বাসার ঠিকানা?"

শুনিয়া লইয়া যুবক নক্ষত্র বেগে গাড়ী চালাইল।

গাড়ীর মধ্যে সকলেই নিস্তব্ধ। আজিকার এই অভিজ্ঞতা সামান্য নহে। সকলেই নীরবে বর্ত্তমানে অতিক্রান্ত ভীষণ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী নির্দ্দিষ্ট হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। যুবক এতক্ষণ একবারও ফিরিয়া কোন দিকে তাকায় নাই।

প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া পুরাতন ভৃত্য হরিচরণ বাহিরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোটর থামিতেই সে ছুটিয়া আসিল।

কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া বীরেশ বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। ইজ্জত ও প্রাণ রক্ষকের নাম এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিবার মত মনের অবস্থাও তাঁহার ছিল না। যুবক তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া মোটর ঘুরাইয়া লইতেই বীরেশবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমাদের ইজ্জৎ, সম্ভ্রম, মান রক্ষাকারীর নামটা—"

বাধা দিয়া যুবক বলিল, "কোন দরকার নেই। মানুষের কর্ত্তব্য পালন করতে পেরেছি এই যথেষ্ট। নাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায়ের পথটা আমার ভাল লাগে না।"

যুবক চাকার হাতল ঘুরাইল।

বীরেশ বাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তবু আমাদের তরফ থেকে—"

যুবক গলা বাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জীবনে আর হয় ত আমাদের কখনও দেখাই হবে না। কাল ভোরেই দিল্লির পথে চল্‌ব। শুধু আমার নমস্কার নিয়ে আমায় মুক্তি দিন।"

গাড়ী দ্রুত রাজপথে চলিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পথের বাঁকে তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল।

বীরেশ বাবু স্তব্ধভাবে তখনও পথের উপর দাঁড়াইয়া। হোটেলের ফটকের ধারে হৈমবতী ও গৌরী স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া ছিল।

বীরেশবাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য ছেলে।"

হৈমবতী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, বাছা আমার দীর্ঘজীবী হয়ে এম্‌নি করে দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে থাকুক।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "ধন্য শক্তি ! ধন্য সাহস !"

গৌরী নতমুখে মাতার অনুসরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

MOHEARY

আঠারো

"তুমি ?—তুমি হঠাৎ কোথা থেকে ভাই ?"

প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বিকাশ অনিলকে বাহিরের ঘরে একরকম টানিয়াই লইয়া গেল।

অনিলচন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, অনেক দিন তোমাদের কোন পত্র লিখিনি। তা, মণীশ এখন কোথায় ?"

"সে এখন কলকাতায় নেই, ভাই। শুনেছ, চিত্রজগতে সে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "তোমাদের সংবাদ আমি রাখি। যদিও মাস ছয়েকের মধ্যে তোমাদের চিঠি লিখিনি বটে। সে এখন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী, সে সংবাদ আমার ভালই জানা আছে। তার পর তুমি এখন কি করছ ?"

বিকাশ সহাস্যে বলিল, "বাঙ্গালীর ত দু'টি পথ, হয় কেরাণীগিরি, নয় ত মাষ্টারী বা ওকালতি। আমি এখন—কলেজে একটা প্রফেসারি জুটিয়ে নিয়েছি। তার পর তুমি ? সিভিল সার্ব্বিসের পদ পেয়েছিলে জানি, নাও নি সে খবরও রাখি। এখন কোথায় আছিস্ বল ত ভাই ?"

অনিলচন্দ্র সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুর দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমারও ঐ গতি। পলাশপুরের কলেজের পড়াবার কাজ নিয়েই আছি। মণীশ কোথায় গেছে বললি ?"

"কল্যাণপুরের নবীন মহারাজ তার চিত্রশিল্প-প্রতিভায় মোহিত হয়ে গেছেন। তাকে দিয়ে কতকগুলো ছবি আঁকিয়ে নেবার জন্য, পূজোর সময় তিনি তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে গেছেন। আজ সকালেই তা'র ফিরবার কথা: লাহোর থেকে যে চিঠি পেয়েছি তাতে তাই লিখেছে।"

এমন সময় বিকাশের পিতা বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলেন। পুত্রের অন্যতম অকৃত্রিম সুহৃদ অনিলচন্দ্রকে তিনি উত্তমরূপেই জানিতেন। এক সময়ে মণীশ ও অনিল উভয়েই তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল।

অনিলচন্দ্র বন্ধুর পিতা ও প্রথম জীবনের আদর্শ শিক্ষাগুরুকে দেখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। বিকাশের পিতা সস্নেহে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার সাফল্যের সংবাদ আমি শুনেছি, বাবা। তিন বিষয়ে এম্-এ দিয়ে প্রত্যেক বারে প্রথম স্থান অধিকার করেছ, এ সংবাদ আমার অগোচর নেই। সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষাতেও তুমি জয়লাভ করে সে পদ নাও নি, তাও আমি জানি। এজন্য তোমার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা হয়েছে, বাবা।"

শিক্ষক মহাশয়ের প্রশংসা-বাক্যে অনিলচন্দ্র ঘামিয়া উঠিল। লজ্জার অরুণ রাগ তাহার সুগৌর মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন মানুষ হতে পারি।"

"হ্যাঁ বাবা, সে আশীর্ব্বাদ আমি সর্ব্বদাই তোমাদের তিন বন্ধুকেই করে থাকি। মণীশও খুব নাম করেছে।"

বিকাশ ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "অনিল, আয় ভাই, মা তোকে ডাক্‌ছেন।"

"যাও বাবা, যাও" বলিয়া বিকাশের পিতা জামা জুতা খুলিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে বিকাশ বলিল, "তুই কোথায় উঠেছিস্ ?"

অনিল বলিল, "আমার মামা ভবানীপুরে নতুন বাড়ী তৈরী করেছেন। মা ও বাবা সেখানে এসেছেন। আমি কাল কলকাতায় দুপুরে এসে পেঁৗছেছি। সেখানেই আছি।"

বিকাশের মাতা হাস্য মুখে পুত্রসম অনিলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কাছে বসাইলেন। নানা কুশল প্রশ্নাদির পর বিকাশের মাতা বলিলেন, "তা বাবা অনিল, তোরা তিন বন্ধু কি যে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছিস—বিয়ের নামই নেই।"

বিকাশ তখন ব্যস্তভাবে ঘরের এক কোণে একখানি ছবি খুলিয়া লইয়া মুছিতেছিল। অনিলচন্দ্র মাথা নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বিকাশের মাতা পুনরায় বলিলেন, "এমন সব সোনার চাঁদ ছেলে, লেখাপড়া শেষ করে সবাই টাকা রোজগারও আরম্ভ করেছে, অথচ এরা সংসারীর কাজ কর্ত্তে ভয় পায় ! কি যে দিন কাল পড়েছে !"

বিকাশ এবার সম্মুখে আসিয়া ছবিখানি একখণ্ড কাপড়ের সাহায্যে মুছিতে মুছিতে বলিল, "সকল মায়েরই ঐ এক কথা।"

মাতা দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এক কথা ত হবেই। তোরা সব অন্যায় করবি, আর মা বাপ সে অন্যায় কাজের কথা তোদের মনে করিয়ে দেবে না ?"

বিকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বিয়ে না করা কি পাপ কাজ ?"

"পাপ নয় ? সংসারে থাক্‌বি অথচ সংসার-ধর্ম্ম পালন করবি না, এটা অন্যায় কাজ নয় ? পাপ নয় ? সন্নিসী হয়ে যা না, কেউ তোদের দুষ্‌বে না।"

বিকাশ সেইরূপই হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, "মাসীমা—মণীশের মাও ঐ কথা বলেন।"

"সবাই তাই বল্‌বে বাবা। তোরা আজ কাল বক্তৃতা দিস, কাগজে লিখিস বিধবাদের বিয়ে দাও। তাতে ত খুব উৎসাহ দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের ঘরের আইবুড়ো মেয়েরা কি করবে বল ত? তারা দিন দিন কোন্ পথে ভেসে চলে যাবে, সে ভাবনা কারও নেই। কি যে তোরা স্বদেশী করিস্, বাবা!"

এবার পুত্রদিগের তরফ হইতে কোনও উত্তর আসিল না। অনিল মৃত্তিকা-নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতেই বসিয়া রহিল। বিকাশও মুখ ফিরাইয়া লইয়া মনোযোগ সহকারে ছবির গায়ের ময়লা তুলিতে লাগিল।

মাতা বলিয়া চলিলেন, "এই যে তোরা তিনটি ভাল ছেলে—তিনটি মেয়েকে সংসারে সুখী করতে পারিস্; কিন্তু সত্যিকার দেশ-ভক্তি তোদের আছে বলে আমি ত মনে করি না। তা যদি থাক্‌ত, তবে তিনটি মেয়ের জীবনের দুর্ভাবনা—তিনটি পরিবারকে কন্যাদায়ের বিশ্রী ভাবনা থেকে উদ্ধার করে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারতিস্ না?"

বিকাশ এবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল। এ যুক্তির বিরুদ্ধ যুক্তির উল্লেখ করিয়া সে তাহার জননীর স্নেহময় প্রাণে বেদনা দিতে চাহিল না।

অনিলচন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার আননের ব্যথাতুর ভাব বিকাশকে আহত করিল। অনিল কেন এখনও বিবাহ করে নাই, তাহার সম্পূর্ণ হেতু সে জানিত না; কিন্তু তাহার মনে এ সম্বন্ধে একটা আভাস অনেক দিন হইতেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। মণীশকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা উভয়েই যে এখনও পর্য্যন্ত দাম্পত্য জীবনে অগ্রসর হয় নাই, এ সত্য বিকাশ ত মনের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না!

ছেলেদের নীরব দেখিয়া বিকাশের মাতা আর কোন কথা বলিলেন

না। অনিল বলিল, "মণীশের আজ পৌঁছুবার কথা আছে, একবার সেখানে গেলে হয়। তার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।"

বিকাশ বলিল, "চল্ সেখানে যাই। এতক্ষণ হয় ত সে পৌঁছে গেছে।"

মা বলিলেন, "তোরা কিছু খেয়ে যা বাবা!"

অনিল বলিল, "না মাসীমা, আমি ভোর বেলা ভবানীপুর থেকে জল খেয়ে বেরিয়েছি, এখন ক্ষিদে নেই।"

বিকাশ বলিল, "মণীশ বোধ হয় আজই আস্‌বে। আজ রাতে আমরা তিনবন্ধু একসঙ্গে এখানে খাব। তুমি তার যোগাড় করে রেখো। কেমন অনিল?"

অনিল বলিল, "সেই ভাল।" তার পর, দুই বন্ধু বাহির হইয়া গেল।

উনিশ

আশ্রমের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে মণীশচন্দ্র কোন ক্রটি করিল না। দৈহিক শ্রম অথবা আর্থিক সাহায্য, কোন কিছুতেই সে কার্পণ্য প্রকাশ করিল না। সাধুচরণ বাবু তাহার আন্তরিক চেষ্টা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন, মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "দীর্ঘজীবী করে রাখুন ভগবান আপনাকে। আপনি না থাকলে আমাদের এ পাড়ার যে কি হোতো বলতে পারি না।"

মণীশের অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। এ সব ত মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, ইহার জন্য স্তুতির কি প্রয়োজন? কিন্তু এই স্তুতিবাদ অপেক্ষা আরও একটা জিনিষ তাহাকে বড়ই মনঃপীড়া দিতে লাগিল। এই যে সাধুচরণ বাবু বলিয়া গেলেন,—পরস্ত্রী মায়েরই মত, তার চিন্তা করিলেও পাপ, এ কথা কি মিথ্যা? কিন্তু সে কি করিতেছে? মনের কাছে ত পাপ অগোচর থাকে না। তবে? সে অহরহ কাহার চিন্তা করিতেছে? সে কি পরস্ত্রী নহে? তাহার স্বামী মানুষের মত মানুষ,—সে তাহারই ঘরণী, তবে তাহার চিন্তাতেও কি তাহার পাপ নাই? সে পুরুষ মানুষ, ভগবান তাহাকে ভাল মন্দর—হিতাহিতের জ্ঞানশক্তি দিতে কার্পণ্য করেন নাই। তবে সে যাহা পাপ বলিয়া জানে, সে পাপচিন্তা মন হইতে উপাড়িয়া ফেলে না কেন? তাহার স্নেহময়ী জননী—জগতে যিনি পরমারাধ্যা দেবী—তাঁহার মনের কষ্ট কি সে বুঝে না? তিনি যে

নিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, নিত্য নয়নাসারে নিভৃত নিশীথের উপাধান সিক্ত করিতেছেন, সে জানিয়া শুনিয়াও সন্তান হইয়া তাঁহার এ দুঃখ ঘুচাইবার চেষ্টা করে না কেন? এ জগতে কোন্ সন্তান মাতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারে? দশমাস দশদিন জঠরে ধারণ করিয়া কত কষ্ট বিপদ বরণ করিয়া যিনি তাহাকে এ সংসারের আলোক দেখাইয়াছেন,—হৃদয়ের শোণিতবিন্দু দান করিয়া যিনি তাহাকে পুষ্ট করিয়াছেন,—যাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া সে তাহার জীবনের প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াছে,—কতদিন কত রজনী অনাহারে অনিদ্রায় কালাতিপাত করিয়া যিনি তাহার রোগে শোকে সেবাসান্ত্বনা দান করিয়াছেন,—সেই দেবীরূপিণী জননীর প্রতি কি তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই? স্বার্থপর সে, আপনার সুখ, আপন স্বার্থ অন্বেষণেই ব্যস্ত,—এ স্বার্থ বলি দিয়া সে কি জননীর স্বার্থের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইবে না?

আদর্শ,—আদর্শ,—মস্ত বড় কথা! কিন্তু এ আদর্শ ত পাপ-কলুষিত—পাপের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ যে আশ্রমের তরুণী, সেও ত বলিতে পারে, তাহার প্রেমাস্পদের প্রতি তাহার একনিষ্ঠ আকর্ষণও তাহার আদর্শ! কিন্তু উহাই যদি আদর্শ হয়, তবে উহার উপর কি সমাজবন্ধন অথবা সমাজশৃঙ্খলা দৃঢ়মূল হইতে পারে?

না, না, সহজ বুদ্ধিই ত বলিয়া দেয়,—সংসারে জননী, ভগিনী, জায়া, কন্যার সহিত পুরুষের যে স্নেহ প্রেমের মধুর বন্ধন, তাহাতে বাধ্যবাধকতার কঠিন কর্কশ হৃদয়হীনতা না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাতে স্বেচ্ছার স্বচ্ছ সরল বেদীর উপর পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না কেন? অনন্ত অম্বুধিবক্ষে বায়ুতাড়িত কর্ণহীন নৌকার মত উদ্দাম উন্মত্ত বাসনা-তাড়িত মানুষের মন কর্ণধার হীন হইলে নৌকার মত অবস্থা হয়। মানুষের পশুত্ব আছে, কিন্তু তার সঙ্গে তার বিচার বিবেক শক্তিরও ত

অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অভ্যাস—সংযম,—ইহার দ্বারা কি উৎক্ষিপ্ত মনকে প্রকৃতিস্থ করা যায় না?

বড় কঠিন—বড় দুঃসাধ্য এ নিয়ন্ত্রণের শক্তি আয়ত্ত করা রক্ত মাংসের শরীর মানুষের। কত সংযমী যোগী মুনি ঋষিরও তপোভঙ্গ হয়, তাঁহাদেরও ত্রুটি বিচ্যুতি হয়, সামান্য সংসারের মানুষ সে, সে কি করিতে পারে, কতটুকু করিতে পারে? দেহের উপর নিয়ন্ত্রণের শক্তি মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য না হইলেও একবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু মন? উঃ বড় কঠিন! দুঃসাধ্যই বটে! না, না, সে মনের গোপন কোণে অতি সঙ্গোপনে সেই স্মৃতির পূজা করিবে,—কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না, নীরবে সে চিন্তা [illegible]মনের মধ্যেই রহিয়া যাইবে, নীরবে তাহার ইহজীবনের লীলাবসানে [illegible] বিলীন হইয়া যাইবে,—

“দা[illegible] একখান পত্তোর আছে,—”

চিন্তা[illegible] হইল, চমকিয়া উঠিয়া মণীশ বলিল, “অ্যাঁ, পত্র? কৈ দেখি [illegible]।”

নীলমণি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানির বাহিরের শিরোনামা দেখিয়া মণীশ বুঝিল পত্র আসিতেছে বাল্য-বন্ধু অনিলের নিকট হইতে। মনটা অমনি দুলিয়া উঠিল,—অনিল? বাল্যবন্ধু অনিল, আর তার—

মণীশ তাড়াতাড়ি পত্র পাঠে মনোনিবেশ করিল। পত্রে এই কয়টি ছত্র লেখা ছিল :—

ভাই মণীশ,

আমাদের এখানকার গ্রামে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইতেছে। উহার মধ্যে চিত্রশিল্পেরও স্থান আছে। আমার বড় ইচ্ছা, তোমার একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র ইহার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। যদি এমন

কোন চিত্রাঙ্কন শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করি, সেখানি তুমি যথাসময়ে এখানে পাঠাইয়া দিবে। আর পার যদি, তুমি নিজে আসিয়া সে খানি একজিবিট করিয়া পারিতোষিক লইয়া যাইবে। এই নিভৃত পল্লী-নিবাসেও তোমার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। শুনিয়া বিস্মিত হইবে, তিনি অনূঢ়া কুমারী, নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের কন্যা, কিন্তু শিক্ষিতা। শুনিয়াছি, সঙ্গীতের মত এ বিদ্যায়ও তাঁহার পারদর্শিতা আছে। কাজেই ভাবিও না যে, এই নিভৃত পল্লীতে তোমার অবিসম্বাদী প্রতিভার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কিছু নাই! আমি তোমার অনুমতি না লইয়াই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তোমার নাম দিয়া দিয়াছি। বড় মুখ করিয়া এ কাযে হাত দিয়াছি, জানি তুমি আমায় নিরাশ করিবে না।

আশা করি তোমরা ভাল আছ। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিও এবং আমাদের আরাধ্যা মাতৃদেবীকে আমার সশ্রদ্ধ সভক্তি প্রণাম জানাইও। এখানকার কুশল। ইতি

তোমার অভিন্নহৃদয়

অনিল।

মণীশ পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্ষণকাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিল। একবার, দুইবার, তিনবার পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিল। হিন্দুর ঘরের অনূঢ়া শিক্ষিতা কুমারীর এখনকার কালে কোথাও অভাব নাই, অন্ততঃ রাজধানী কলিকাতা অথবা মফঃস্বলের প্রধান সহরসমূহে যে নাই, একথা সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু চিত্রশিল্পবিদ্যায় পারদর্শিনী? আশ্চর্য্য বটে!

মণীশের মানসপটে অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায় ধীরে ধীরে রেখাপাত করিয়া যাইতে লাগিল। আর্য্যসভ্যতার সে কি যুগই না গিয়াছে! বাসবদত্তা,

সাগরিকা,—চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় সে যুগের আর্য্যমহিলারা কি পারদর্শিতাই না দেখাইয়া গিয়াছেন! কেবল কি চিত্রাঙ্কন? চারুকলাশিল্পের কোন বিভাগেই না আর্য্যনারীর কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল! নৃত্যগীত, নাট্য অভিনয়, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের কমনীয় কোমল কণ্ঠ, কর বা চরণন্যাসের মহিমা বিস্তৃত হইয়াছিল। আর আজ? অধঃপতিত পরাধীন জাতির এই সমস্ত চারুকলাবিদ্যা লুপ্তপ্রায়, যাহা কিছু পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার মধ্যে বিদ্যার্থে বিদ্যার্জ্জনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে না, উহার মধ্যেও যৌনলিপ্সার নিকৃষ্ট স্তরের বিকাশ হইতেছে। একি সামান্য দুঃখের কথা!

ইহারই জন্য কি আজ হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুর হইতে এই বিদ্যাসাধনার প্রচেষ্টা দূর হইয়াছে? এই শিক্ষিতা অনূঢ়া কন্যার পিতা সুপণ্ডিত কি না জানি না; তবে তিনি যে আনুষ্ঠানিক হিন্দু তাহা অনিলের পত্রে জানিতেছি। এই নিষ্ঠাবান পরিবারের বিবাহযোগ্যা কুমারী চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় এমন পারদর্শিনী হইলেন কি প্রকারে, তাহা জানিতে বড়ই কৌতূহল হয়। তাঁহার পিতা কিম্বা ভ্রাতা কি এ বিদ্যায় সুপণ্ডিত? নতুবা নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরচারিণীর পক্ষে এ বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব হইল কিরূপে?

তবে মণীশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একাধিক মণীষী চিত্রকরের জীবন কথা পাঠ করিয়া জানিয়াছে, তাঁহারা শৈশব হইতেই গুরুর নিকট শিক্ষালাভ না করিয়াই অঙ্কনে অভ্যস্ত হইয়াছেন,—কি এক অলৌকিক ঐশী প্রেরণা তাঁহাদের মানস মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। Born Poet এর মত Born Artistও জগতে দুই একটি যে আবির্ভূত হন না, এমন নহে। এই আশ্চর্য্য কন্যার মধ্যেও কি তবে সেই ঐশী প্রেরণা আবির্ভূত হইয়াছে?

আশ্চর্য্য বটে! নিভৃত বঙ্গপল্লীর অন্তঃপুরচারিকা বালিকা কুল-ললনা,—সে কেমন, তাহার চিত্র কেমন,—দেখিতে বড় আকুল আকাঙ্ক্ষা হয় কেন? মণীশ স্বয়ং চিত্রকর—চিত্রকরের প্রতি চিত্রকরের এ কি স্বাভাবিক আকর্ষণ? কে জানে!

না, অনিলের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা চলে না, যত প্রয়োজনীয় কার্য্যই থাকুক, এ আহ্বানে সাড়া দিয়া একবার নিভৃত পল্লীর কোমলা অন্তঃপুরচারিকা চিত্রকরীর চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য দেখিয়া আসিতে হইবেই। সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্চর্য্য চিত্রকরীর মানুষী প্রতিমাখানি দেখিবার প্রবল বাসনা মণীশের মনে জাগিয়াছিল কি?

বিশ

এমন ভাবে এই তিন বন্ধুর পরস্পর মিলন দীর্ঘকাল ঘটে নাই। বিকাশের দ্বিতলের এক পার্শ্বস্থ কক্ষে বসিয়া তিন বন্ধু সন্ধ্যার অবকাশ নানা আলোচনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল।

বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মধু-স্মৃতিভরা মুহূর্ত্তগুলি অতীত যবনিকার অন্তরাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্ল যৌবন মধ্যাহ্নের মিলন ক্ষেত্রে যেন অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিতেছিল। ডিস্‌রেলীর ছাত্রজীবন সংক্রান্ত অমোঘ বাণীটি আজ বিকাশের মনে বারবার উদিত হইতেছিল।

শিক্ষা-মন্দির—বিশ্ববিদ্যালয় জীবন প্রভাতে বহু বন্ধু মিলাইয়া দেয়। কিন্তু সংসারের রথচক্রের পেষণে মানুষ যখন পিষ্ট হইতে থাকে—অর্থ, যশ, কীর্ত্তির পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মানুষ যখন ব্যর্থতার হাহাকারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, অথবা সার্থকতার উচ্চ চূড়ে উন্নীত হয়, তখন পূর্ব্বের বন্ধুত্ব কোথায় বিলীন হইয়া যায় তাহা অনুমান করাই কঠিন হয়। জীবনের রথচক্র মধ্যপথে থামিয়া না গেলে—বন্ধুর সংসার-বর্ত্মের এখানে সেখানে মাঝে মাঝে হয় ত পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ মিলিয়া যায়; তখন হয় ত তথা-কথিত মৌখিক অর্থহীন কুশল প্রশ্ন অথবা উভয় পক্ষ হইতে একটু কাষ্ঠ হাসির বিনিময় অতীতকে বিদ্রূপ করিতে থাকে।

মানব-জীবনের এই পরিণতি সম্বন্ধে বন্ধুত্রয়ের জীবনে এখনও পর্য্যন্ত

কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। এখনও বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মাদকতাভরা তাহাদের জীবনের সমুদয় রঙ্গীন অংশে বাস্তবের নিকষকৃষ্ণ যবনিকা তুলিয়া উঠে নাই, এখনও অনাবিল বন্ধুত্বের প্রবল প্রবাহধারা তর তর বেগে অন্তরকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান ও ছেলেদের প্রেয় আহার্য্যগুলি প্রস্তুতের অবকাশে বিকাশের জননী, তাহাদের অগোচরে মাঝে মাঝে মিলন-আনন্দে অভিভূত আলোচনা-মগ্ন যুবক তিনটিকে দেখিয়া যাইতেছিলেন। বহু—বহু দিন তিনি এমন দৃশ্য দেখেন নাই। ভগবান! ইহাদিগকে সুখী কর, তৃপ্তি ও আনন্দ দান কর!

বিকাশ বলিয়া উঠিল, "আজ কিন্তু আমরা তিনজন এই ঘরেই ঘুমুবো!"

অনিল বলিল, "আমি মাকে বলে এসেছি, আজ আর ভবানীপুরে আস্‌তে পারবো না।"

মণীশ বলিল, "মা জানেন এখানেই আমার রাত্রিবাস।"

পল্লী সহরের অতীত জীবন-যাত্রার দৃশ্যগুলি তাহাদের বোধ হয় মনে পড়িতেছিল। অনিল মণীশের দক্ষিণ করপুট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কিন্তু ভাই, তোমার প্রতিশ্রুতি ভুলো না। আমাদের স্বদেশী মেলায় তোমার একখানা নতুন ভাল ছবি দেওয়া চাই-ই।"

মণীশ বলিল, "তা নিশ্চয় দেব। এখনো ত একমাসের উপর সময় আছে। একখানা ছবি এর মধ্যে হয়ে যাবে।"

বিকাশ বলিল, "আচ্ছা অনিল, তুই সারা দিন সেখানে কি করে কাটাস বল্‌ ত, ভাই? সঙ্গী তোর বড় কেউ আছে বলে ত মনে হয় না।"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "কেন, কেতাব-কীটের সঙ্গীর অভাব কি? কাউপার যেমন বলেছিলেন গ্রন্থাগার তাঁর সহধর্ম্মিণী। ও যে রকম কেতাব-কীট তাতে সঙ্গীর অভাব ওকে দুঃখ দিতে পারে না।"

বিকাশ বলিল, "সে কথা ঠিক। তা ছাড়া চরকাও ত আছে।"

অনিলচন্দ্র সরল প্রাণে উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। বন্ধুরা তাহার সম্বন্ধে অভ্রান্ত।

মণীশকে সে বলিল, "তোর সে ব্যায়ামচর্চ্চা এখনও চলছে ত?"

বিকাশ বলিল, "ওর চেহারা দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না, ভাই? বঙ্কিমবাবুর সে বর্ণনাটা মনে আছে ত? ভাষাটা ঠিক মনে পড়ছে না, কোমলতায় এমন বলময়। ও তাই। রোজ ঘণ্টাখানেক স্যাণ্ডোর প্রক্রিয়া ও চালাবেই।"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "বিকাশ এ বিষয়ে যে সাধুপুরুষ নয় তা ত তুমি জানই। ও আবার আমায় জুজুৎসু আর লাঠি খেলাও শিখিয়েছে।"

অনিল বলিল, "ওসব একটু আধটু জেনে রাখা ভাল। বাঙ্গালীকে যদি জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করতে হয়, তবে বলিষ্ঠ, ব্যায়ামপটু দেহ ও সুস্থ সবল মনের অধিকারী হতে হবে। কলেজে এ বিষয়টা আমি ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

চিন্তিতভাবে বিকাশ বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর গম্ভীর ভাবে বলিল, "ভাই, একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ কি না জানি না। কলকাতায় ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, ছেলেরা যেন মেয়েলি ঢঙ্গে চলবার ফিরবার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। খেলা-ধূলার উৎসাহ অনেকের মধ্যে আছে বটে; কিন্তু যাদের মধ্যে সাহিত্যিক মনোবৃত্তি একটু আছে, ললিতকলার যারা পক্ষপাতী, তারা যেন পৌরুষের চর্চ্চা কুস্তাকে অপরাধ বলে মনে করে।"

মণীশ বলিল, "এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতবিরোধ নেই। বাঙ্গালী তার পূর্ব্ব পুরুষদের পৌরুষ হারাতে বসেছে। এটা দুর্লক্ষণ।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "কিন্তু মফঃস্বলের ছেলেদের মধ্যে এ দোষটা কম দেখ্‌তে পাচ্ছি। সহর ও মফঃস্বলে এ পার্থক্য কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমরাও ত এখনো তরুণদলের বাইরে গিয়ে পড়ি নি। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে এ মনোবৃত্তির যোগ নেই।"

মণীশ বলিয়া উঠিল, "আমাদের প্রথম শিক্ষা মেসোমশায়ের কাছে, সে কথাটা ভুলে যেও না।"

অনিল বুঝিল, বিকাশের পিতার কথাই মণীশ বলিতেছে। শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত অবনত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "সে সৌভাগ্য সত্যি সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁর আদর্শ আমার জীবনে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।"

বিকাশ কথাটার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া বলিল, "মণীশ, তোর দেশ-ভ্রমণের একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা কি বল্‌বি বলছিলি যে। সেটা ত শোনা হয় নি।"

অনিল বলিল, "হ্যাঁ ভাই, সেটা শোনা যাক্।"

মুহূর্ত্তে মণীশ যেন গম্ভীর হইয়া পড়িল। ডিবা হইতে একটা পাণ তুলিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে সে বলিল, "মহারাজার সঙ্গে কাশী হয়ে সোজা আমরা আগ্রায় যাই। মহারাজা লোকটা সৌখীন সে কথা বলা বাহুল্য। সঙ্গে একখানা মোটর। ওটা চালাবার কৌশল অনেক দিন আগেই শিখে নিয়েছিলুম। কোথাও যখন একলা বেড়াতে যেতাম, তখন নিজেই হাঁকাতাম। তোরা ত জানিস নির্জ্জনতার আমি ভারী ভক্ত। ও রোগটা তোদের দু'জনেরও আছে। আগ্রায় যাবার উদ্দেশ্য অনেকগুলো ছিল। মানুষের শিল্প-প্রতিভার অনেকগুলো অতুলনীয়

নিদর্শন সেখানে মূর্ত্তি ধরে আছে। সেদিন পূর্ণিমা। ভারী ইচ্ছে হল, সাজাহানের প্রেমস্বপ্নের মূর্ত্ত-বিগ্রহ তাজের সাম্‌নে বসে বাঁশী বাজাব।" মণীশ সহসা নিমীলিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল।

বন্ধুযুগল মণীশের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত সুন্দর মুখমণ্ডলে একটা আনন্দদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নয়ন উন্মীলিত করিয়া সহাস্যমুখে সে বলিল, "সে সুন্দর, পবিত্র, মনোরম দৃশ্যের কথা জন্মে কখনও ভুলব না। কোন লোক যে ভুলতে পারে, সে কথা বিশ্বাস করি নে। আকাশে মেঘের বিন্দুমাত্র রেখাও নেই। যমুনার দিকে তাজের পেছনে একটা নির্জ্জন স্থান খুঁজে নিয়ে বসে পড়লাম। লোকজন সেদিন ছিল না বললেই হয়। অনেকক্ষণ ধরে জ্যোৎস্নায় নাওয়া তাজের মহিমা দেখে—সৌন্দর্য্যের জোয়ারে প্রাণটা কাণায় কাণায় ভরে উঠলো। বাঁশীটা বাজাতে আরম্ভ করে দিলুম।"

মণীশ আবার নীরব হইল। বিকাশ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া ছিল। অনিলচন্দ্রও মুগ্ধভাবে শুনিতেছিল। সহসা সে যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কথা বলিয়া সে মণীশের একাগ্রতাকে ভঙ্গ করিতে চাহিল না।

"তারপর, কতক্ষণ বাঁশী বাজিয়েছিলুন মনে নেই। বার বার সুরটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজিয়ে শেষে ঘড়ী বার করে চেয়ে দেখ্‌লাম, দশটা বাজে। আর রাত করা ঠিক নয়। মহারাজা আমায় সঙ্গে না নিয়ে কোন দিন খান না। মোটরখানা চাবি দিয়ে অচল করে বাইরে রেখে এসেছিলুম। বাঁশীটা পকেটে রেখে তাজকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। খানিক দূর গিয়ে ফটক পার হবার সময়—" মণীশ থামিল। সোজা হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

বন্ধুরা দেখিল, বন্ধুর আয়ত নয়ন-যুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে রোষবহ্নি অকস্মাৎ এমন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল কেন ?

"দেখ্‌লাম, দুটো জোয়ান লোক একজন পুরুষকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। তাঁর দুজন সঙ্গিনী স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে উঠলেন। পাষণ্ডরা সঙ্গের তরুণীকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে।"

অনিল সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বাধা দিয়া মণীশ বলিল, "না বন্ধু, পারেনি তারা। একজন পদাঘাতে লুটিয়ে পড়ল। আর একজনকে গলা টিপে শুইয়ে দিলাম। এতদিনের শক্তি সাধনা ব্যর্থ হয় নি, ভাই। শুধু ছবি আঁকার তুলি টেনে জীবনটা নারীর মত কোমল করে পৌরুষহীন করে তুলি নি।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিকাশ বলিল, "এ যে উপন্যাসের মত চমকপ্রদ! তার পর ?"

"বদমাস্‌রা বেগ দেবার চেষ্টা একটু করেছিল, কিন্তু বন্ধু, তোমার জুজুৎসু শিক্ষা আর অব্যর্থ মুষ্টির আঘাত কাজে লেগে গেল। মোটরে করে তার পর তাঁদের তুলে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিলুম।"

অনিলচন্দ্রের নয়ন যুগল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বিকাশ বলিল, "রোমান্স ঐখানেই শেষ। আর কিছু এগোল না ?"

মণীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "তার মানে ?"

"না, ভাই, আমায় ক্ষমা কর। তুমি যে ও-সবের অতীত তা জানি।"

অনিলচন্দ্র চমৎকৃত হইয়াছিল। ভ্রমণ-প্রত্যাগত বীরেশ বাবুর মুখে সেদিন এই ঘটনার কথা সে শুনিয়াছিল ; কিন্তু তাহার নায়ক যে তাহারই অন্তরঙ্গ বন্ধু মণীশ, ইহা সে ভ্রমেও কল্পনা করিতে পারে নাই।

সে কি বলিতে যাইবে, এমন সময় বিকাশের মা আসিয়া বলিলেন, "তোরা ওঠ। ঠাঁই হয়েছে, আর দেরী নয়—দশটা বাজে।"

অনিলচন্দ্র কি ভাবিয়া প্রসঙ্গের আলোচনাটা স্থগিত করিল। তার পর তিন বন্ধু আহারের জন্য বিকাশের মাতার অনুসরণ করিল।

একুশ

অপরাহ্ণের আলোক জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষকগণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কন্যার অবয়ব—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমালোচকের ন্যায় পরীক্ষা করিতেছিলেন। বীরেশবাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ ও নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতুলচন্দ্রের সহিত অনিলচন্দ্রও পরীক্ষা-সভার এক পাশে আসিয়া বসিয়াছিল।

অনিলের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া বীরেশবাবু চারিদিকে কন্যার জন্য পাত্র সন্ধান করিতেছিলেন। বিক্রমপুরের কোনও শিক্ষিত পরিবারের উচ্চ-শিক্ষিত একটি পাত্রের পক্ষ হইতে, পাত্রের পিতা, মাতুল ও খুল্লতাত গৌরীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ছয় জোড়া তীক্ষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টির আঘাতে গৌরী অগ্রহায়ণ মাসেও ঘামিয়া উঠিতেছিল।

কেতাবতী বিদ্যার পরীক্ষার পর শিল্প-নৈপুণ্যের পরীক্ষা গৃহীত হইল। গৌরী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। সুতরাং এই পরীক্ষার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া গৌরী বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পাত্র-পক্ষের তরফ হইতে পাত্রীর রূপ-গুণের পরীক্ষার কার্য্য সমাপ্ত হইলে কন্যাপক্ষীয়রা অনুমান করিলেন, পাত্র-পক্ষ এ বিষয়ে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গৌরী তখন ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইল। বীরেশবাবু স্বয়ং তাহাকে অন্দরে প্রবেশ করিবার দ্বার পার করিয়া দিয়া আসিলেন।

পরামর্শান্তে পাত্রের মাতুল বলিয়া ফেলিলেন, কন্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের পক্ষ হইতে বিশেষ কিছু আপত্তি হইবে না। অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা যদি সঙ্গতভাবে হয়, তাহা হইলে এখনই তাঁহারা কথা পাকা করিয়া যাইতে পারেন। অগ্রহায়ণের শেষ দিকে তাঁহারা বিবাহ দিতে চাহেন। কারণ, পাত্র বিবাহের পরই বিলাত যাত্রা করিবে। সুতরাং বীরেশবাবু যদি তাঁহাদের দাবী মিটাইতে পারেন, তাহা হইলে এইখানেই বিবাহ দেওয়াতে তাঁহাদের আপত্তি হইবে না। পাত্র বিলাতে যাইবে বলিয়া অগ্রহায়ণের মধ্যে যে কোনও স্থানে বিবাহ দিবেন, অবশ্য যদি দরে বনিবনাও হয়!

অনিলচন্দ্র এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে চাহিয়াছিল। 'দর' কথাটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে একবার বক্তার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

বীরেশবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনাদের অভিপ্রায় জান্‌তে পারলে আমি অগ্রসর হতে পারি। তবে অনুগ্রহ করে মনে রাখ্‌বেন, আমি ধনী নই।"

পাত্রের মাতুল আদালতে পেস্‌কারী করেন। এখানকার জজ আদালতেই তিনি কাজ করিতেছেন। সেই সূত্রেই পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলিলেন, "বীরেশবাবু, আপনি পণ্ডিত লোক, সুতরাং আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, পণ্ডিত জামাই পেতে গেলে টাকার মায়া করলে চলে না।"

অনিল চেয়ারের উপর চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রতুলচন্দ্রও আসনে সোজা হইয়া বসিলেন।

বীরেশবাবু বলিলেন, "তা জানি, নগেনবাবু। কিন্তু অবস্থার অতিরিক্ত ত মানুষের কাজ করবার সামর্থ্য নেই।"

এবার প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তা আপনাদের দরটা কি তাই বলুন না, নগেনবাবু।"

মুন্‌সেফদের মধ্যে প্রতুলচন্দ্র বিচারকালে কড়া হাকিম, সে কথা নগেনবাবু জানিতেন। বিশেষতঃ জজ সাহেবের সঙ্গেও তাঁহার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ন্যায় বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, সে খবরও তাঁহার অগোচর ছিল না। সুতরাং নগেনবাবু কণ্ঠস্বর বেশ মোলায়েম করিয়াই বলিলেন, "ওঁদের আঁচ, মেয়েকে বীরেশবাবু যা ইচ্ছে হয় দেবেন, তবে হাজার তিনেক টাকার কমে যেন অলঙ্কারগুলো না হয়। বরাভরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন বক্তব্য ওঁদের নেই। ঘর সাজান আস্‌বাবপত্র, সোনার রিষ্টওয়াচ্, অর্গান এ সব ত উনি নিজেই দেবেন। সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য। তবে ছেলের বিলেতে পাঁচ বছর থাক্‌তে হবে, সেজন্য হাজার দশেক টাকা ওঁদের দরকার আছে। এ আর পাত্র হিসাবে এমন বেশী কিছু নয়, কি বলেন বীরেশবাবু?"

বীরেশচন্দ্র এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। পাত্রপক্ষের ক্ষুদ্র তালিকার ভারে তিনি ধীরে ধীরে সম্মুখের আসনে বিবর্ণ মুখে বসিয়া পড়িলেন।

প্রতুলচন্দ্র রসলেশহীন কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "পাত্রটির যাতায়াতের জাহাজ ভাড়া কি ঐ দশ হাজারের মধ্যে?"

এবার পাত্রের খুল্লতাত বলিলেন, "নগেনবাবু সে কথাটা বল্‌তে ভুলে গেছেন। হিসাব করে যা পড়ে সেটা অবশ্য বীরেশবাবুই পরে দেবেন। তার জন্য কোন চুক্তি অবশ্য আমরা কর্‌তে চাই নে।"

অনিলচন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এতক্ষণ চুপ করিয়াই বসিয়া ছিল। এইবার সে তাহার স্বভাব-সুলভ ধীর কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা নগেনবাবু, আপনার ভাগিনেয় এম্-এ-তে কোন্ ক্লাশ, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

নগেনবাবু এই নূতন জনপ্রিয় তরুণ অধ্যাপকটিকে বিশেষ ভাবেই চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "এম্-এ পাশ সে এখনও করে নি। বি-এ পাশ করেই বিলেত যাচ্ছে।"

"ওঃ!" বলিয়াই অনিল চুপ করিয়া গেল।

বীরেশবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "নগেনবাবু, আপনি ত আমার অবস্থা জানেন। এত টাকা দেবার সঙ্গতি আমার নেই।"

পাত্রের পিতা এবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি কত খরচ করতে পারেন, বীরেশবাবু?"

"মোট পাঁচ হাজার টাকার বেশী মেয়ের বিয়েতে খরচ করবার সামর্থ্য আমার নেই।"

পাত্রের খুল্লতাত উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিক্ত কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "বিক্রমপুরের কুলীনশ্রেষ্ঠ বসুবংশের সঙ্গে তা হলে আপনার কুটুম্বিতা করা শোভা পায় না।"

অনিলচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমরা কিন্তু গাভার প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশের এম্-এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট ছেলেকে মাত্র দু হাজার টাকা খরচ করে ঘরে এনেছিলুম। প্রতুলবাবু এখানকারই মুন্‌সেফ্, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

বীরেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের দাবী মেটা-'বার সাধ্য আমার নেই। কি আর করব—মেয়ের অদৃষ্ট!"

পাত্রপক্ষ গম্ গম্ শব্দে ঘর কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রতুল-চন্দ্র অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার শ্যালকের পানে চাহিলেন। অনিলচন্দ্র তখন নতনেত্রে ভূমিতলে কি দেখিতেছিল।

বাইশ

শয্যার উপর দেহভার এলাইয়া দিয়া অনিলচন্দ্র অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভৃত্য অনেকক্ষণ ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। অনিলচন্দ্রের সে দিকে খেয়ালই ছিল না। সে নীরবে উপরের দিকে চাহিয়া চিন্তারাজ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল।

কনিষ্ঠা সহোদরার নিকট হইতে সে মৃদু তিরস্কার পাইয়াছিল। প্রতুলচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ম্মম। কিন্তু অনিলচন্দ্র প্রতিবাদ করিতে ত পারে নাই। এ সকল কথার বিরুদ্ধে বলিবার কিই বা আছে!

বীরেশ বাবুর কন্যা প্রিয়দর্শনা, সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, বরং তাহাকে বিশেষ অনুকূল মতই প্রকাশ করিতে হইয়াছে। গুণের দিক দিয়া এমন কন্যা হাজারে একটা পাওয়াও কঠিন, সে কথা অনিলচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেই প্রকাশ করিয়াছে। বংশমর্য্যাদা এবং পিতৃ-মাতৃ পরিচয়? সে বিষয়ে অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, বরং এমন সর্ব্ববিষয়ে গুণবান পিতা এবং মাতা কয়টি বাঙ্গালী পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়?

তবে?—তবে এই কন্যাকে গ্রহণ না করিবার অনিলচন্দ্রের সমক্ষে কি সঙ্গত কারণ উপস্থিত থাকিতে পারে? চির-কৌমার্য্যকে সে নীতি

বা বিশ্বাস হিসাবে বরণ করিয়া লয় নাই, এটুকু সে সহোদরা ও ভগিনী-পতির নিকট প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সংসারী মানবের পক্ষে, যাহারা উপার্জ্জনক্ষম, সুস্থ-সবল-দেহ, তাহারা কোনও কারণেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার গুরু দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে না, করা কর্ত্তব্য নহে, এ কথা তাহাকে মানিয়া লইতে হইয়াছে। ব্যর্থ প্রেমের জন্য সে চিরকুমার ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে না, ইহাও অনিল চন্দ্র তীব্র প্রতিবাদের সহিত সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে।

তবে কন্যাদায়গ্রস্ত এই সমধর্ম্মী প্রবীণ অধ্যাপকের কন্যাকে বিবাহ করিতে তাহার বাধা কোথায়? তাহার পিতামাতা এ প্রস্তাব শুনিবামাত্র সাগ্রহে মত করিবেন। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কাছে তাহার কোন অজুহাতই বিচারসহ হইবে না, তাহা অনিলচন্দ্র উত্তমরূপে জানে। এতকাল বিবাহ না করিবার যে সকল আপত্তি সে পর পর প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি এখন অন্তর্হিত। অর্থোপার্জ্জন সে স্বয়ং করিতেছে, পিতার সঞ্চিত সম্পত্তি ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত সামান্যও নহে। দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ যাহারা করে, তাহারা যে বিবাহ করিলেই দেশ-সেবা ব্যর্থ হইয়া যায়, এমন যুক্তি গায়ের জোরে ছাড়া প্রতিপন্ন করাও ত চলে না।

সবই সত্য। কিন্তু কোথায় তাহার বাধা, সে কথা ত প্রকাশ করিয়া বলা চলে না, বলা সঙ্গতও নহে। তাহার জননীর অন্তরের ব্যথা দূর করিবার জন্য বিবাহ করিবার কথা মনে পড়িবামাত্র আর এক জনের জননীর কথা তাহার অন্তরের দ্বারে তীব্রভাবে আঘাত করিল।

যদি সে কোনও দিন তাঁহার মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তবেই সে নিজেও তাহার জননীর হৃদয়ব্যথা দূর করিবে। নহিলে, তাহার

জীবনে শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে যদি প্রথম হইতেই বন্ধু-জননীর দুঃখের হেতু না হইত, সে যদি বন্ধুকে উৎসাহ না দিত, তাহা হইলে আজ তাহার বন্ধু-জননীকে এমন নৈরাশ্যপূর্ণ দুঃখময় জীবন যাপন করিতে হইত না।

সেদিনও তিনি তাহার হাত ধরিয়া কত অনুনয় বিনয় করিয়া বন্ধুর মতপরিবর্ত্তনের আবেদন জানাইলেন। তিনি ত জানেন না, তাঁহার পুত্র কতখানি ব্যর্থতা অন্তরে বহন করিয়া চির কৌমার্য্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে। সে কথা প্রকাশ করা অসম্ভব। শুধু তিনজন ব্যতীত চতুর্থ কোন নরনারী তরুণ জীবনের এই বিয়োগান্ত অবস্থার হেতু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। জীবন থাকিতে সে কথা তাহারা প্রকাশ করিতে পারিবে না।

বন্ধুর কল্পনাকে, কামনাকে সার্থক করিয়া তোলার পক্ষে এমন বাধা ঘটিবে, ইহা যদি সে ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিত, তাহা হইলে এমন অবস্থা যাহাতে না ঘটিতে পারে, সে ব্যবস্থার জন্য অন্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিত; কিন্তু তরুণ, উদার, কল্পনাপ্রবণ মন কোন দিক হইতে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতার আভাস পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারে নাই যাহা শোভন, সঙ্গত এবং অনিবার্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, যে পথ সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুমোদিত বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল, সেই পথে সেই শোভন ব্যপারটিকে তাহারা সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

চিন্তার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া অনিলচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, আহার্য্য প্রস্তুত। অনিলচন্দ্র ভৃত্যকে বলিয়া দিল সে ও পাচক আহারাদি শেষ করিয়া ফেলুক, আজ তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষুধা নাই।

ভৃত্য বহুদিনের পুরাতন। মাতা তাহাকে পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সে সঙ্গে থাকিলে তাঁহার পুত্রের কোন অসুবিধা হইবে না।

নিমাই দাদাবাবুর এমন ক্ষুধামান্দ্য কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। সে বিস্মিত ভাবে বলিল, "কিছু খাবেক না দাদাবাবু? দিদিমণি ঢেক রকমির খাবার তৈরী করি দেলেন যে আজ। না খালি তিনি দুঃখু করবেন।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "তবে ঠাকুরকে এখানে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যেতে বল। যদি খানিক পরে ক্ষিদে পায়, খাব।" নিমাই দেখিল, তাহার দাদাবাবুর মুখ শুধু বিষণ্ণ নহে, বিবর্ণ। কোন কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া সে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে রন্ধনাগারের দিকে চলিয়া গেল। অনিলচন্দ্র টেবলের সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিল। টেবলের এক ধারে পিতা মাতা, অপর ধারে তাহার, মনীশ ও বিকাশের আলোকচিত্র। তিন বন্ধুতে এক সঙ্গে এই চিত্র তুলিয়াছিল।

নির্নিমেষ নেত্রে সে মনীশের প্রতিভাপ্রদীপ্ত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে জানিত, মনীশ, বিকাশ ও তাহার মধ্যে যে অনাবিল বন্ধুত্ব বিদ্যমান, সহসা মানুষের মধ্যে তাহা দুর্লভ। তাহার বিশ্বাস, তাহাদের তিনজনের মধ্যে মনীশের প্রতিভার দীপ্তি সমধিক উজ্জ্বল। মনীশের কল্পনায় প্রচুর সৃষ্টি-ক্ষমতা সঞ্চিত হইয়া আছে। প্রথম জীবনে ব্যর্থতার যে আঘাত-বেদনা সে পাইয়াছে, যদি তাহা না ঘটিত, তবে সহস্রধারায় মনীশের প্রতিভা চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িত। নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনিলচন্দ্রের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস পর্য্যাপ্ত থাকিলেও মনীশের চিত্ত কিরূপ দৃঢ়, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। দুর্ব্বলতা তাহার মনের কোনও প্রান্তে উদিত হইতে সাহস পায় না। সেই গভীর, উদার, মহৎ হৃদয়ে নীচতার স্থান নাই। তাহা চপল, চটুল নহে। একবার যাহা

তাহার মনে স্থান পায়, গভীর ভাবে তাহা রেখা কাটিয়া অচল অটল
হইয়া থাকে।

সুতরাং এই দৃঢ়চেতা বন্ধুর মত পরিবর্ত্তনের আশা সুদূরপরাহত
কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না ঘটে, ততদিন তাহার পক্ষেও কৌমার্য্যকে
পরিহার করা অসম্ভব। না এ বিষয়ে অন্য কোন পথ নাই। সে সম্পূর্ণ
ভাবেই নিয়তির হস্তে এ বিষয়ে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সংসারী মানুষ তাহার এই মনোভাব ও দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনিয়া
হাসিবে, বিদ্রূপ করিবে, ইহা সে জানে। তাই সে তাহার মনের কথা
বন্ধুদিগের নিকট হইতেও গোপন করিয়া রাখিয়াছে। অনিলচন্দ্র নীরবে
বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

তেইশ

যাহা চিত্তক্ষেত্রের নিভৃততম স্থানে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধ্যানের সাহায্যে অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু লেখনী বা তুলিকার সাহায্যে তাহাকে কি সম্পূর্ণভাবে রূপ দেওয়া চলে না?

গৌরী তাহার অঙ্কিত চিত্রপটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথাই ভাবিতেছিল। আসন্ন মেলার প্রদর্শনীতে সে একখানি চিত্র দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীরা তাঁহাদের বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য নানা প্রকার চিত্রশিল্প পাঠাইতেছেন। এ প্রতিযোগিতায় তাহার এই অক্ষম প্রয়াসসঞ্জাত অতি সাধারণ চিত্রের কোন মর্য্যাদাই থাকিবে না, তাহা সে ভালরূপেই জানে; কিন্তু তথাপি পিতার নির্দ্দেশানুসারে তাহাকে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেই হইবে। অভিজ্ঞ বিচারকের দৃষ্টিতে তাহার চিত্র প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হইবে না, জানিয়া শুনিয়াই সে এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে।

তবে এ কথা সে জানে যে, যত্নের ত্রুটি সে করে নাই। সমগ্র অন্তর দিয়া সে বর্ণ ও তুলিকার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। এজন্য দীর্ঘ দিবা ও দীর্ঘ রাত্রি সে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করে নাই।

চিত্রের অঙ্কন-কার্য্য এতদিনে সমাপ্ত হইয়াছে। তুলিকার শেষ রেখাপাত, শেষ বর্ণবিন্যাস করিয়া আজ সে মুক্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পাইয়াছে। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আগামী কল্য সে পিতার দ্বারা চিত্রখানি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে।

পিতা স্বয়ং চিত্রবিদ্যার গভীর অনুরাগী। তিনি যথাসম্ভব তাহাকে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু প্রদর্শনীক্ষেত্রে সে যে চিত্র দিতে চলিয়াছে, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় পিতাকে সে এতদিন জানায় নাই, তিনিও জানিতে চাহেন নাই।

পাছে তাঁহার সমালোচনা বা মন্তব্যে তাহার কল্পনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এজন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনায় নিরস্ত ছিলেন সে বরাবর দেখিয়া আসিতেছে, শিক্ষাদান কালে তাহার পিতা সকল রকমে তাহার কাছে আলোচ্য বিষয় বিশদ করিয়া তুলিয়া ধরেন। কিন্তু যখন গৌরী তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য সাধনা করিতে থাকে, তখন তিনি আর কোনও প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করেন না।

সন্ধ্যাকালে গৃহস্থালীর সকল কার্য্য শেষ করিয়া গৌরী নিজের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সপ্তমীর চাঁদ শীতের আকাশে ঈষৎ কুহেলিমাখা।

শীতের রাত্রিতেও সে বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হয় নাই। খোলা জানালা দিয়া মৃদু জ্যোৎস্নাধারাধৌত সন্ধ্যার আকাশ-পানে কিয়ৎক্ষণ সে চাহিয়া রহিল। সম্মুখে নদীর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

ধীরে ধীরে সে অঙ্কিত চিত্রখানির আবরণ উন্মুক্ত করিয়া প্রদীপ্ত আলোকে তাহা সমালোচকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিল। যে সময়ের কথা স্মরণ করিয়া সে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তখন ফুল্ল জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর বিচিত্র মাধুর্য্যলীলায়িত অবস্থা। আজিকার এই ক্ষীণদীপ্তি চন্দ্রমার আলোকে তাহা কতকটা অনুভব করা যায় মাত্র।

সহসা তাহার সেই রজনীর ভয়াবহ অবস্থার কথা মনে পড়িল। সে রাত্রির ঘটনা তাহার মানসপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায় নাই কি? সেই স্মরণীয় বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় তাহার মানসিক উদ্বেগ এখনও

তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে। দুরন্ত রিপু-তাড়িত মনুষ্য-পশুর ক্ষুধিত, লুব্ধ দৃষ্টির চিত্র সে কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না। দেবদূতের মত প্রচণ্ড শক্তিশালী যুবক আসন্ন অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, বহুবার সে তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে।

পিতা ও মাতা কতবার এই অপরিচিত যুবকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। অনেক সময় তাহার মনে হয়, এই অপরিচিত, পথের ক্ষণিক দেখা মানুষটির হৃদয় কি মহৎ! নিজের পরিচয় দিয়া কৃতজ্ঞতা আদায়ের স্পৃহামাত্রও তাঁহার ছিল না। বিংশ শতাব্দীর এই ঘোর স্বার্থপরতাপূর্ণ যুগে এমন বাঙ্গালী কি সত্যই আছে? না, সেই পূর্ণিমা রজনীর সে ঘটনা স্বপ্নদৃষ্ট অবস্থার ন্যায় বাস্তবতাশূন্য?

গৌরী কতবার মনে করিয়াছে, সে বোধ হয় দুঃস্বপ্নই দেখিয়াছিল। নহিলে উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে যিনি ঔপন্যাসিকের মানস-চিত্রের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের স্পর্শে অন্তর্হিত দৃশ্যের ন্যায় কোনও পরিচয়ের আভাসমাত্র না দিয়া বিরাট পৃথিবীর জনকোলাহলের মধ্যে তিনি কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেলেন?

গৌরীর মন চিন্তার রাজ্যে এমনই ভাবে চলিতে চলিতে সহসা বাস্তব পৃথিবীর রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। সে মনে মনে যেন একটু সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। সত্য বটে, নারীচিত্ত সাহসী বীরের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়ে—ইহা নারীর স্বভাবধর্ম্ম। কিন্তু এমন ভাবে নাম-গোত্রহীন ক্ষণিক-দেখা অপরিচিত পুরুষের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া লাভ কি?

না, লাভ কিছুমাত্র নাই। তবে তাহার চিত্ত এমন ভাবে প্রায়ই কেন, ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই অজ্ঞাতকুলশীল মানুষটির

সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করে? ইহা কি মানব মনের একটা চিরন্তন অবস্থা? গৌরী চিত্রপটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

চিন্তার বিচ্ছিন্ন সূত্রজাল অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজেদের অবস্থার কথা তাহার মনে পড়িল। পিতার সদাপ্রসন্ন মুখ সে আজকাল সকল সময়েই বিষণ্ণ দেখে, মাতার আননে চিন্তা ও নৈরাশ্যের কালিমা। তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহারা যেন বিমূঢ়, অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন।

কেন? এত দুশ্চিন্তা কিসের? তাহার বিবাহ হইতেছে না, কেহ তাহার নারীজন্ম অনুগ্রহপূর্ব্বক সার্থক করিয়া তুলিতেছে না বলিয়াই ত? নারী এমনই হেয়, এমনই বিক্রেয় পণ্য? তাহার কোন সত্তা নাই, কোন মর্য্যাদা নাই? যাহারা বিবাহ করিতে আসে, তাহারাই এক-তরফা মতামত প্রকাশ করিবে, পছন্দ করিবে, অথবা প্রত্যাখ্যান করিবে? এ অধিকার কে তাহাদিগকে দিয়াছে? নারীর তরফ হইতে অনুরূপ ব্যবস্থা কেন হইবে না?

পিতা মাতার কাছে এ সকল কথা উত্থাপন করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় বলিয়াই এতদিন সে কোন কথা বলে নাই। এখন সে মার কাছে বলিবে, আজীবন সে কুমারীই থাকিবে। সে যে বিদ্যার আলোচনা করিতেছে, তাহাতে কি নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা একান্তই অসম্ভব? তাহা ছাড়া পিতা যে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার অবিদ্যমানে সে অর্থ কি তাহাদের সামান্য প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে? তবে?

গৌরী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর আবরণ অন্যমনস্ক ভাবে টানিয়া দিতে দিতে মনে মনে ভাবিল, পৃথিবীর দুরন্ত মানুষ এবং মনের দুর্দ্দম প্রকৃতির আঘাতের শঙ্কা আছে বটে; কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে, সাধনা

করিলে, এ সকল নিদারুণ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে কেন পারিবে না ?

এমন চরিত্রবান্ পিতা, এমন সাধ্বী জননীর রক্তধারা তাহার ধমনীতে প্রবাহিত। পবিত্র বংশের চিরাচরিত নিষ্ঠা ও সংযম কেন তাহাকে শক্তি প্রদান করিবে না ?

না, সে আজীবন কুমারীই থাকিবে। পুরুষ যখন লাভ-লোকসান খতাইয়া—বাহিরের রূপ ও ঐশ্বর্য্যের ভিত্তির উপরই পত্নী-নির্ব্বাচন করিয়া স্বার্থপরতার চরম নিদর্শন দেখাইতে পারে, তখন নারীরও কর্ত্তব্য, তাহার এই নীচাশয়তার প্রশ্রয় না দেওয়া।

গৌরী সংকল্প স্থির করিয়া ঘরের বাহির হইতেই মাতার আহ্বান তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

চব্বিশ

বন্ধুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অনিল বলিল, "তুই এসেছিস্ ভাই! আঃ! সত্যি আজ আমার যে কি আহ্লাদ হচ্ছে!"

মণীশ সহাস্য মুখে বলিল, "অঙ্গীকার পালন করতে কোন দিন ভুলে গেছি কি, অনিল?"

গাঢ় স্বরে অনিল বলিল, "না,—সে দোষ তোর অতিবড় শত্রুও তোকে দিতে পারবে না। কিন্তু এতটা দৃঢ়তা যদি তোর না থাকৃত!

বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া মণীশ বলিল, "তার মানে?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "ব্যাখ্যা আমি করতে পারব না। থাক্ ও প্রসঙ্গ।"

মণীশ কি বুঝিল, সেই জানে। কিন্তু সে আর এ বিষয়ে কথা বাড়াইল না।

মণীশ জামা জুতা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এখানে এসে দেখ্‌ছি ভালই করেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম, ছবিখানা ইনসিওর করে পাঠিয়ে দেব; কিন্তু শেষে ভাবলাম অনিকে কথা দিয়েছি, বেড়িয়েই আসি। এখানে এসেই দেখ্‌লাম, চমৎকার জায়গা। ভারী ভাল লেগেছে আমার।"

অনিল বলিল, "বিকাশ আসবে না ভাই?"

"সে নিশ্চয় আসবে। তার ছুটি আর পাঁচ দিন পরে আরম্ভ হবে। কলেজ বন্ধ হলেই সে রওনা হবে।"

চিরন্তনীর জয়

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া স্নান-শেষে মণীশ আরাম করিয়া অনিলের পাঠ-কক্ষে বসিল। নিমাই উভয়ের জন্য জলখাবার লইয়া আসিল।

মণীশ বলিল, "এবার ত স্থিত-ভিত হয়েছিস, এখন বিয়ে করে ফেল্। তা হ'লে অভাগা বন্ধুদের আতিথ্য সংকারের জন্য তোকে এমন ব্যস্ত হতে হবে না।"

অনিল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল, "এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! তা বন্ধু, দৃষ্টান্তটা তুমিই আগে দেখাও! সে অভিযোগ ত তোমার সম্বন্ধেও সমানভাবে চলে।"

মণীশ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। পরিহাসচ্ছলে সে যে প্রসঙ্গের আলোচনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই যেন তাহার অন্তরকে বিদ্ধ করিল। প্রসঙ্গের মোড় ফিরাইয়া দিয়া মণীশ বলিল, "ঐ বাংলোটা কার রে? বেশ সুন্দর দেখ্তে ত!"

অনিল বলিল, "তা জানিস নে বুঝি? না, তুই কেমন করেই বা জান্‌বি। ওখানে মুন্‌সেফ প্রতুলবাবু থাকেন, আমার ভগনীপতি রে—তুই তাঁকে আগে কখনও দেখিস নি।

নিবিষ্ট দৃষ্টিতে সেই বাংলোর প্রতি চাহিয়া মণীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "ওঁরা এখানে কত দিন আছেন?"

"তা অনেক দিন—আমার এখানে আসবার অনেক আগে প্রতুলবাবু এখানে বদ্‌লী হয়েছেন।"

এ আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। আহারাদির পর উভয় বন্ধু খানিক বিশ্রাম করিল। তার পর অনিল বলিল, "তা হলে ছবিখানা এবার মেলা কমিটীর আপিসে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্,—কেমন?"

মণীশ বলিল, "তা দিলেই হয়। তবে কমিটীর সেক্রেটারী ত অনিলচন্দ্র বসু?"

অনিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু আপিস ঘর ত এখানে নয়, তা ছাড়া ছবিগুলো মিসেস টম্‌সনের কাছেই পাঠাতে হয়। ছবির আবরণ পর্য্যন্ত তিনি নিজে প্রথমে খুলবেন। তার আগে ছবি দেখবার নিয়ম নেই। এ ছবি বেশ করে প্যাক্ করা আছে ত?"

মণীশ আসবাবপত্রের মধ্য হইতে ছবিখানি সন্তর্পণে বাহির করিয়া বলিল, "কমিটীর নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে।"

অনিল সেই অবস্থায় মণীশের ছবি ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর কাছে ভৃত্য নিমাইয়ের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিল।

অপরাহ্নকালে বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইবার সময় অনিল বলিল, "চল প্রতুলবাবুর সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ পরিচয় করে দিয়ে আসি। কোন আপত্তি আছে?"

মণীশ চলিতে চলিতে বলিল, "আপত্তি আবার কিসের?"

প্রতুলবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া তখন মনোযোগ সহকারে একখানি বই পড়িতেছিলেন। একজন অপরিচিত যুবকের সহিত শ্যালককে আসিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অনিল বলিল, "ইনি প্রতুলবাবু, আমার ভগিনীপতি। আর ইনি আমার বন্ধু প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী মণীশ গুহ।"

প্রতুলবাবু তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মানান্তে সহাস্য-আননে বলিলেন, "আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়—আপনিই মণীশবাবু? ওঃ পরম সৌভাগ্য আমার—"

মণীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমায় লজ্জা দিচ্ছেন প্রতুল বাবু। আপনি পণ্ডিত লোক, মানী জ্ঞানী,—"

প্রতুল বাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "বলে যান, বলে যান, গুণী, মুনি, ফালগুনী, যাজ্ঞসেনী,—"

অনিল বাধা দিয়া বলিল, "থাক, অনেক হয়েছে। এখন ভদ্রলোককে বসান একবার।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ও হো হো, তাও বটে, ওটা বলতে ভুল হয়ে গেছে, কেমন ভুলো মন!—তা যাক, বসুন মণীশ বাবু। আর—থাক, সে সব কথা পরে হবে। এখন কিঞ্চিৎ জলখাবার—চা—"

"না, সে সব সেরে আসা হয়েছে।"

"তবে থাক্। দেখুন চিত্র-শিল্পের মারফতে আপনার পরিচয় আমার কাছে নতুন নয়। আমি আপনার চিত্রের অনুরাগী। আগে জানতাম না,—আপনি অনিলবাবুর বন্ধু। অল্প দিন হ'ল সে সংবাদ অনিলবাবুর কাছেই জেনেছি।"

আলাপ অল্পক্ষণেই বেশ জমিয়া উঠিল। মণীশ এই মার্জ্জিতরুচি পণ্ডিত ব্যক্তিটির সহিত আলাপ আলোচনায় আনন্দলাভ করিল। বিদায় গ্রহণের সময় আসিলে মণীশ বলিল, "চলুন, সহরটা একবার ঘুরে আসি।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমি আপনাদের সঙ্গী হ'তে পারলে সুখী হতাম; কিন্তু নতুন ডেপুটীবাবু একটু পরেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সুতরাং আমার অপরাধ নেবেন না, মণীশবাবু।"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "না, না, সে কি কথা। আপনি বসুন, আমরা ঘুরে আসি।"

প্রতুলবাবু তাহাদের সহিত দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "তা একবার আপনার ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না অনিলবাবু? আপনিও চলুন না, শুনেছি আপনারা ত ছেলেবেলায় ভাই বোনের মতই খেলাধূলো করেছেন।"

মণীশ ঘামিয়া উঠিল, অনিল তাড়াতাড়ি বলিল, "ওঃ সে আর একদিন

হবে'খন। আজ আমার বন্ধুকে আরও দুচার জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে, বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব—"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ওঃ তা হলে আপনারা এগুন, আর আপনার ভগ্নী বোধ হয় এতক্ষণ খিড়কীর দোর দিয়ে বীরেশবাবুদের ওখানে যাত্রা করেছেন। তা হলে নমস্কার। আসবেন রোজ একবার করে যে কদিন থাকেন। আপনার ছেলেবেলার খেলার সাথী ছোট বোনটির সঙ্গে দেখা করে যাবেন।"

মণীশ বাগানে পদার্পণ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অনিল ভাবিতেছিল, এমন অদ্ভুত মানুষ ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কোথাও! তাহাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধের কথা প্রতুলচন্দ্র জানিলেন কোথা? মণীশ তখন অন্যমনস্কভাবে বাগানের দিকে চাহিয়াছিল।

বাংলোর চারিদিকে ফুলের বাগান—গোলাপের স্নিগ্ধ মধুর দীপ্তিতে বাগানটি যেন হাসিতেছিল। তাঁহার সৌন্দর্য্য-লুব্ধ দৃষ্টি চারিদিকে একবার নিক্ষিপ্ত হইল। তার পর বন্ধু-যুগল রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরিচ্ছন্ন সহরের বিভিন্ন অংশ দর্শন করাইয়া অনিলচন্দ্র বন্ধুকে লইয়া নদীর দিকে চলিল। নদী-তীরের মধুর সৌন্দর্য্য শীতের সন্ধ্যাতেও মনোরম।

সেদিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে পূর্ব্বগগনে পূর্ণিমার বৃহৎ চন্দ্র দেখা যাইতেছিল। শীতের কুহেলিকা আজ তেমন গাঢ় নহে। অল্পক্ষণেই চারি দিকে রজতধারার দীপ্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মণীশের কবিচিত্ত এ দৃশ্যে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!"

নদীর ধারে একটি ক্ষুদ্র ঝোপ। দুই বন্ধুতে সেইখানে বসিল। তাহারা যেখানে আসিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে নৌকা ভিড়িবার স্থান।

সখের জল-ভ্রমণ করিয়া কেহ কেহ এখানে নৌকা বাঁধিয়া তীরে উঠিয়া থাকে। নির্জ্জন নদীতীরে বসিয়া বসিয়া দুই বন্ধুতে কত সুখ দুঃখের আলোচনা চলিতে লাগিল। শীতের নদী—তরঙ্গ-শূন্য। জ্যোৎস্না-স্নাত নদী-জলের উপর দিয়া একখানি জেলে ডিঙ্গি বন্ধু যুগলের অদূরে তীরলগ্ন হইল। একটি পুরুষ ও দুইটি নারী ধীরে ধীরে তীরে উঠিলেন। বন্ধু যুগল সেখান হইতে উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। পুরুষটি অগ্রে, তাঁহার পশ্চাতে দুইটি নারী ধীরে ধীরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজপথে উঠিলেন। বন্ধু যুগলকে তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন না। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে মণীশ বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য!"

অনিল বন্ধুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ব্যাপার কি?"

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মণীশ তন্দ্রা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এই তিনজনকে যেন কোথায় আমি আগে দেখেছি। ঠিক মনে হচ্ছে না; কিন্তু এটা ঠিক, এঁরা আমার চোখে নতুন নন্। হাঁ নিশ্চয়! তাই ত কোথায় এঁদের দেখেছি!" অনিলের চক্ষুযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বন্ধুর প্রতি নিবিষ্ট ভাবে চাহিয়া বলিল, "তোমার ভুল হয় নি ত?"

"পাগল, এত ভুল হলে কি ছবি আঁকতে পারতাম? কিন্তু কোথায় দেখলাম এঁদের!"

তিনটি নরনারী তখন রাজপথের অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। বন্ধুর হাত ধরিয়া অনিল বলিল, "চল, রাত হয়েছে। কোথায় এঁদের দেখেছ সে কথা বাসায় গিয়ে ভাল করে ভেবে দেখো।" মণীশ নীরবে বন্ধুর সহিত বাসার দিকে ফিরিল।

পঁচিশ

মেলা আরম্ভ হইয়াছিল। জেলার হাকিম উদ্বোধন কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সহরের গণ্যমান্য এবং কর্ম্মীসম্প্রদায় এই স্বদেশী মেলাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা বহুলাংশে সার্থক হইয়াছিল। দূর পল্লী হইতে বহু লোক মেলা দেখিতে সহরে আসিতেছিল; কৃষিবিভাগ, উটজপণ্য-শিল্প-বিভাগ, চিত্র শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রদর্শনের আয়োজন হইয়াছিল।

আজ চিত্র-শিল্পাগারের উদ্বোধন হইবে। মিসেস টম্‌সন উহার উদ্বোধন কার্য্য উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করিবেন। সে জন্য সহরের সকলেই মেলা প্রাঙ্গণের পটমণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন। বিকাশ আজ সকালেই বন্ধুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে। আহারাদির পর বন্ধুত্রয় সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পল্লীসহরে এমন একটা মেলার আয়োজন দেখিয়া বিকাশ অত্যন্ত বিস্ময়ানুভব করিল।

মণীশ বলিল, "এ প্রচেষ্টার মূলে আমাদের ত্যাগী সন্ন্যাসী বন্ধু অনিলের প্রাণপণ আগ্রহ ও চেষ্টা আছে, এ কথা অনেকের মুখেই শুন্‌ছি।"

অনিল লজ্জিত ভাবে বলিল, "কি যে বলিস্ তোরা। কায অবশ্য মানুষ করে, কিন্তু মূলে যে তাঁরই কল্যাণ চেষ্টার আশীর্ব্বাদ রয়েছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন, ভাই!"

বিকাশ বলিল, "সে কথা ঠিক, কিন্তু যন্ত্রীর গুণ গাইবার সঙ্গে যন্ত্রের গুণের প্রশংসা মানুষ যদি না করে, তাহ'লে সেটা দেখতে খারাপ হয় না কি?"

মেলার প্রবেশ-দ্বারে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। মণ্ডপতলে দর্শকগণ সমবেত হইয়াছিলেন। অনিল বন্ধুযুগলকে লইয়া সভানেত্রীর আসনের নিকটেই উপবেশন করিল।

মিসেস্ টম্‌সন্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রসন্ন আনন চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। অদূরে উপবিষ্ট অনিলচন্দ্রকে দেখিয়া, তাহার অভিবাদনের বিনিময়ে অভিবাদন ফিরাইয়া দিয়া তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইলে সভানেত্রী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট বচনে বলিলেন, "আপনাদের সযত্ন-সংগৃহীত চিত্রপূর্ণ চিত্রাগারের দ্বার উন্মোচন উপলক্ষে আমি আপনাদের কাছে একটি নিবেদন করতে চাই। মেলা-কমিটী আমাকে চিত্র সম্বন্ধে গুণাবলীর বিবেচনা করে, যে চিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে তা নির্ব্বাচন করবার ভার দিয়েছেন। অবশ্য এ কাযে সাহায্য করবার জন্য কয়েকজন গুণী ব্যক্তি দ্বারা তাঁরা একটা কমিটীও গঠন করে দিয়েছেন।

"সংগৃহীত চিত্রগুলি আমরা সকলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখেছি। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি মতে বিচারে যা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত সার আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। তার পর চিত্রাগারে প্রবেশ করে আমাদের নির্ব্বাচন ঠিক হয়েছে কি না, তা ত আপনারা পরীক্ষা করে দেখবার অবকাশ পাবেন।

"চিত্র-শিল্পে বাঙ্গালাদেশের উন্নতি দেখে আমি সত্যই বিস্মিত হয়েছি। অবশ্য অনেক চিত্র-শিল্পী মৌলিক পরিকল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নি,

এ কথাটাও এই সঙ্গে বলে রাখা সঙ্গত মনে করি। বিদেশী প্রতিভাবান চিত্রকরের অনুকরণে, শুধু অনুসরণে নহে, তাঁরা ছবি এঁকেছেন। কিন্তু মৌলিক পরিকল্পনা এবং খাঁটি ভারতীয় পরিকল্পনার পরিচয়ও কেহ কেহ দিয়েছেন—অবশ্য তাঁদের সংখ্যা অল্প।

"সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে দু'খানি ছবি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই দুই চিত্র-শিল্পীর বিষয়বস্তু একই। কমিটী এই বিচিত্র সাদৃশ্য দেখে সন্ধান নিয়ে জেনেছেন, এই দু'জন প্রতিভাবান চিত্র-শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করেন, পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু চিন্তারাজ্যে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে। জানি না, কোন বিস্ময়কর মুহূর্ত্তে এঁরা দু'জনেই একই বিষয়কে চিত্র-রচনার উপযোগী মনে করেছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী টেবিলের উপর হইতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া লইয়া খুলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ বিস্ময়ে বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। মণীশ চমৎকৃতভাবে অনিলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এ বড় অদ্ভুত কাহিনী ত!" অনিল নীরবে মৃদু হাসিল। বিকাশ বলিল, "সাহিত্যে এমন বিচিত্র সাদৃশ্যের কথা পড়া গেছে বটে।"

সভানেত্রী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, এই দুই চিত্র-শিল্পীর একজন পুরুষ, তিনি ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বলে শুনেছি। অপরা নারী, হিন্দুগৃহের কুমারী কন্যা!—" শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল।

মিসেস্ টম্‌সন্ কণ্ঠস্বর আরও উন্নত করিয়া বলিলেন, "মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অগোচরে, বস্তু-তান্ত্রিক জগতের অতীত মনোরাজ্যে কি অদ্ভুত লীলা চলে, মানুষ এখনও তার সম্পূর্ণ সন্ধান পায় নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোন নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক অবস্থার মধ্যে পড়ে পরস্পরের

অপরিচিত এই তরুণ চিত্র-শিল্পী এবং এই তরুণী অন্তঃপুরচারিণী একই বস্তুকে উপলক্ষ করে চিত্র অঙ্কিত করেছেন। নিপুণতার দিক দিয়ে পুরুষ চিত্র-শিল্পী যে অভিনব সৌন্দর্য্য তাঁর অঙ্কিত চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর চিত্রখানি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু তরুণী চিত্র-শিল্পীও ভাবের দিক দিয়ে যে ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর ছবিখানিও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তাই আমরা স্থির করেছি, এই দু'খানাই একই বন্ধনীর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে।"

সভানেত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার দর্শকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর কোন্ কোন্ চিত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়া তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করিলেন।

মণীশ চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া এই অভিভাষণ শ্রবণ বরিতেছিল। তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "মিসেস টম্‌সনের বর্ণনাভঙ্গী ত চমৎকার!"

সভানেত্রী তার পর বলিলেন, "এখন হয় ত আপনারা প্রথম দু'জন চিত্রশিল্পীর নাম জান্‌বার জন্য কৌতূহলী হয়েছেন। পুরুষ-শিল্পীর নাম মিঃ মণীশ গুহ—"

মণীশ চমকিত হইয়া উঠিল। বিকাশ বলিল, "এ আমি জান্‌তাম। রসজ্ঞ সমালোচকরা মণীশের প্রতিভাকে অস্বীকার কর্‌তে পারেন না।"

শ্রোতৃবৃন্দের করতালি-ধ্বনি থামিলে কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া মিসেস্ টম্‌সন্ বলিলেন, "আর এই তরুণী চিত্র-রচয়িত্রী আমাদের এই সহরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বীরেশ বাবুর কন্যা কুমারী গৌরী ঘোষ"—উচ্চ করতালি ধ্বনিতে প্রায় দুই মিনিট কাল সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

মণীশ বিস্মিতভাবে বলিল, "এ মেয়েটিকে তুমি চেন অনিল?"

বিকাশ বলিল, "আশ্চর্য্য! বীরেশবাবুর নাম শুনেছি, দূর সম্পর্কে

তাঁর স্ত্রী মার বোন্ হন। মেয়েটির পাত্র জুটছে না বলে সেদিন মাকে তিনি পাত্রের খোঁজের জন্য পত্র লিখেছেন। আমাকেও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এমন গুণবতী!"

অনিল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার বলিল, "বীরেশ বাবু তোর আত্মীয় হন, সে খবর ত আমার জানা ছিল না!" মণীশ আপন মনে বার দুই অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!"

মিসেস্ টম্‌সনের কথা আবার শুনা গেল। তিনি বলিতেছিলেন, "এবার আমি গিয়ে চিত্রাগারের দ্বারোন্মোচন করব। তার পর আপনারা যথারীতি চিত্রগুলি দর্শন করে ধন্য হবেন। কেবল একটা কথা আমি এখানে না বলে পারছি না। এই মেয়েটি বাইরের কোন সাহায্য না পেয়ে, তাঁর বাপের কাছে উপদেশ ও প্রথম শিক্ষা পেয়ে নিজের প্রতিভা-বলে যে সুন্দর ছবিখানি এঁকেছেন, এ জন্য আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করছি। আর কমিটীর নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার ছাড়াও আমি তাঁকে একটি মেডেল দিতে চাই।"

আবার সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি সভা-প্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া তুলিল। বীরেশবাবু সভাক্ষেত্রের এক প্রান্তে বসিয়া ছিলেন। তিনি উদ্গত-প্রায় আনন্দ-অশ্রুধারাকে অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বারোন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যক্তি চিত্রাগারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ভিড় একটু কমিলে অনিলচন্দ্র বন্ধুযুগলের সহিত চিত্রাগারে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই মণীশ তাহার চিত্র দেখিতে পাইল। "জ্যোৎস্নালোকে তাজ" চিত্রের পার্শ্বেই দেখিল আর একখানি চিত্র। তাহার শিরোনামা শুধু "জ্যোৎস্নালোকে।" অনিল বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!" বিকাশ বলিল, "আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, কিন্তু—"

তিনজনেই গৌরী-রচিত চিত্রখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, এই চিত্রখানিতে তাজ জ্যোৎস্নার ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দাঁড়াইয়া। তাহার কিছু দূরে একটি ভয়ার্ত্তা নারী। তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য একজন দুর্ব্বৃত্ত হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। তাহার নয়নে লালসার কি উগ্র দীপ্তি! আর একজন বলিষ্ঠ তরুণ আক্রমণকারীর গলদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে!

মণীশ আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! চমৎকার! কিন্তু এ দৃশ্য—" বিকাশ বলিয়া উঠিল, "মণীশ! এ যে তোর গল্পের ছবি বলেই মনে হচ্ছে!" অনিলচন্দ্র সহসা আপনাকে দৃঢ় বলে সংবরণ করিল। মণীশ ঈষৎ বিচলিত ভাবে বলিল, "তাই ত দেখছি। তবে--ওঃ! অনিল, সেদিন জ্যোৎস্না রাতে যাঁদের দেখেছিলুম!— মনে পড়েছে, তাঁরাই, তাঁরাই!"

মণীশের মনের কোনও প্রান্তে আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র রহিল না। সে তখন বলিল, "নিশ্চয় এঁদের সঙ্গে তোমার জানা শোনা আছে, অনি?"

মৃদু হাসিয়া অনিল বলিল, "তা আছে বৈ কি। তবে শুধু বীরেশ বাবুর সঙ্গে। বহু বচন হিসাবে নয়!"

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "অনিলের স্বভাবটা এক রকমই রয়ে গেল। রহস্য করবার অবকাশ পেলে কখনই ছাড়বে না।"

অন্যান্য চিত্র দর্শনের পর মণীশ মাঝে মাঝে আত্মগত ভাবে বলিয়া উঠিতে লাগিল, "আশ্চর্য্য কিন্তু! ভারী আশ্চর্য্য!"

বিকাশ বন্ধুকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অনিলচন্দ্র তাহার গা টিপিয়া নিষেধ করিল। বিকাশ অনিলের ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও সে বন্ধুর সতর্কতার সম্মান রক্ষা করিল।

ছাব্বিশ

শীতের প্রভাত। তখনও কুহেলিকার যবনিকা চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে।

হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই নিম্নোল্লিখিত বন্ধুত্রয়ের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। অনিলচন্দ্র তাহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া চলিয়াছিল, সমাজের লোক যতই শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হইতেছে, মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শ হইতে ততই তাহারা নীচে নামিয়া চলিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক প্রভাব, প্রাচ্য সভ্যতার অনাড়ম্বর উদারতাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ, এই ভাবে চলিলে, কখনই আশাপ্রদ হইবে না, এ কথা সে জোর করিয়া বলিতে পারে।

বিকাশ বলিল, "কিন্তু আমরাই ত সে সমাজের লোক। আমরা ইচ্ছা করলে অনেক অনাচারের প্রতিবিধান করতে পারি। খাঁটী বাঙ্গালী জীবনকে অবলম্বন করতে বাধা কোথায়?"

মণীশ বলিল, "তাই করাই ত দরকার। তরুণ দলের পর্য্যায়ে আমাদের নাম নিশ্চয়ই আছে। সংস্কারের দিকে শক্তি-প্রয়োগ করাই ত দরকার।"

অনিল বলিল, "কিন্তু আমাদের মন যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েই রয়েছে। এই ধর না কেন বিবাহে পণপ্রথা। এটার সংস্কার কি সাধ্যের অতীত?"

মণীশ বলিল, "এটা ত সহজেই হতে পারে। হচ্ছেও অনেক।"

অনিল হাসিয়া বলিল, "অনেক নয়, কদাচিৎ দু' একটা। এই ধর না

কেন, বীরেশবাবুর মেয়ে। দেখতেও চমৎকার—অবশ্য গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু চেহারা খুব সুন্দর। গুণের কথা কি আর বলব! লেখাপড়া, সূচিশিল্প, গান বাজনা চমৎকার শিখেছেন। আর চিত্রশিল্পের পরিচয় ত নিজের চোখেই পেয়েছ। অথচ মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে না। যে আসে, সেই দশ পনের হাজার চেয়ে বসে।" এই বলিয়া সম্প্রতি যে ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। বিকাশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "এরা কি মানুষ!" মণীশ চেয়ারের উপর একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

বিকাশ র‍্যাপারখানা গায় জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "আমরাও ত এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারি। অবশ্য আমার মাস্‌তুতো বোন। তোমরা দুজন ত বিয়ে কর নি। একজন কেন এমন চমৎকার মেয়েটিকে বিয়ে কর না। তোমাদের কারুরই ত অন্নবস্ত্রের অভাব নেই।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বন্ধু-যুগলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মণীশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ হইল।

"অনিলবাবু উঠেছেন না কি?"

"কে প্রতুলবাবু? আসুন, আসুন!"

বাহিরে যাইবার সজ্জায় ভূষিত হইয়া প্রতুলচন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনিল বলিল, "এত সকালে কোথায় চলেছেন?"

"আর ভাই, আমার বোন্ মেলা দেখ্‌বে বলে ভারী উৎসুক হয়েছে। কিন্তু লোকের অভাবে আসতে পারছে না। বোনাই মফঃস্বলে আদায়ের চেষ্টায় গেছেন। তাই তাকে আনবার জন্য যাচ্ছি। ষ্টীমার আটটায় ছাড়বে। সেখানে পৌছুতে বারটা বাজ্‌বে। আজই তাকে নিয়ে ফিরব। তবে আস্‌তে রাত হবে। আপনার বোন্ রইল। কথাটা

বল্‌বার জন্য এসেছিলাম। আর তা ছাড়া আপনার বন্ধুরাও রইলেন, তাঁরাও তাঁর অপরিচিত নন, বাল্য বন্ধু,—কি বলেন ?”

মণীশ কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। সত্যই অনিল যাহা বলিয়াছে তাহাই, এমন অদ্ভুত মানুষ খুব কমই দেখা যায় বটে!

বিকাশ একটু শ্লেষের স্বরে বলিল, “তা বটে, কিন্তু বাড়ীর যিনি মালিক তিনি কর্ত্তব্যের ভার পরের উপর ফেলে দিয়ে অন্যত্র পলায়ন করছেন, অথচ তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণও করে যাচ্ছেন। এটা যেন কেমন দেখাচ্ছে না ?”

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “ওঃ তাই নাকি ? তবে ত মস্ত ভুল হয়ে গেছে দেখছি। তা, ভগ্নীর বাড়ীতে ভাইদের নিমন্ত্রণ না করলে যেতে নেই বা ভগ্নীর সঙ্গে দেখাশুনো করতে নেই, এটা ত স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে কোথাও আছে বলে শুনিনি। সত্যি বলছি, বিকাশবাবু, আপনি মণীশ বাবুকে নিয়ে অনিলবাবুর সঙ্গে আমাদের ওখানে যাবেন, তা হলে তাঁরও একলা মুখ বুজে থাকার মনোটনিটা ভেঙ্গে যাবে।”

বিকাশ বলিল, “তা ঠিক। আমাদের দেশে ত অবরোধ নেই, অন্তঃপুর আছে বটে। বোরখা ঢেকে পথে বেরুনো বা ঘরের মধ্যে কয়েদী হয়ে থাকাটা আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য বা মনের প্রফুল্লতার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। বাপ, ভাই বা স্বামীর সঙ্গে যদি আমাদের মেয়েরা বাইরে যান বা আপনার জনদের সামনে বেরিয়ে আলাপ পরিচয় করেন, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।”

প্রতুলচন্দ্র সহর্ষে বলিলেন, “একজ্যাক্টলি সো,—আমিও ত তাই বলছিলুম। তা হ’লে ঐ কথাই রইলো, আপনারা যাবেন আমার ওখানে মণীশ বাবু! তা, আমি চল্লুম এখন।” প্রতুলচন্দ্র বিদায় লইলেন। আলোচনায় বাধা পড়ায় প্রসঙ্গটা আর উঠিল না।

মধ্যাহ্ন-আহারের পর বিকাশ বলিল, "বীরেশ বাবুর বাড়ীটা··মাসীমার বাড়ীটা নদীর ধারে, সহরের দক্ষিণে বলছিলে না? সেখানে আমি একবার যাব। তোমরা গল্প কর, আমি সেখান থেকে ঘুরে আসি।"

বিকাশ চলিয়া গেলে দুই বন্ধু শয্যার উপর শয়ন করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। দিবা নিদ্রার স্বভাব কাহারও ছিল না। চিত্রাগার হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে মণীশ একটু স্বল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা অনিল লক্ষ্য করিয়াছিল। এরূপ অবস্থা তাহার যে নূতন তাহা নহে, যখনই কোন একটা কল্পনা তাহার চিত্তে জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই সময় মণীশ কম কথা কহে, ইহা অনিল ও বিকাশের অগোচর ছিল না। তার পর যখন তাহার কল্পনা বর্ণ ও তুলিকার সহযোগে রূপ গ্রহণ করে, তখন মণীশের এই গাম্ভীর্য্য বা অন্যমনস্ক ভাব অন্তর্হিত হয়।

দূরে কোতোয়ালীর ঘটিকা-যন্ত্রে চারিটা বাজিয়া গেল। নিমাই আসিয়া দুইজনের জলখাবার দিয়া গেল। দুই বন্ধু জলযোগ সারিবার পর অনিল বলিল, "একবার ও বাসাটা ঘুরে আসি। মণীশ চল্ না আমার সঙ্গে।" মণীশ বলিল, "যাবো?"

"একা বসে কি করবি? ওখানে খানিক বসে তার পর বেড়াতে গেলে হবে। বিকাশ সন্ধ্যার আগে ফিরবে বলে মনে হয় না। তার পর না হয় একবার তিনজনে মেলার দিকে যাওয়া যাবে। কি বলিস?"

"তাই চল।" মণীশ জুতা জোড়া পায় গলাইয়া দিল।

প্রতুলবাবুর বাংলোয় উপস্থিত হইয়া মণীশ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বোনের শরীর এখন ভাল আছে?" তরলিকার বিবাহের পর আজ সর্ব্ব প্রথম মণীশ অনিলচন্দ্রকে তাহার সহোদরা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।

অনিলচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে বলিল, “সে ভালই আছে। তার শরীর আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করবি?”

“মন্দ কি!”

অনিলচন্দ্র বন্ধুর দৃষ্টিতে একটা উজ্জ্বলতা এবং কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্যের ব্যঞ্জনা অনুভব করিল কি? অনিল বলিল, “আচ্ছা, তুই বোস এখানে, আমি একবার প্রতুলবাবুকে খুঁজে আসি, তিনি বোধ হয় কাপড় চোপড় পরে যাত্রার উদ্যোগ করছেন।” বাহিরের ঘরে মণীশকে বসাইয়া অনিল ভিতরে চলিয়া গেল।

মণীশ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার হৃদ্‌পিণ্ড যেন দ্রুত তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটা অনুভূতির দহন-জ্বালা যেন ক্রমেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পৌষের শীতল বাতাস তাহার ললাটের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিল। সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া সে উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিল। অদূরে গোলাপ-বীথির ডালে ডালে কতকগুলি বড় বড় গোলাপ ফুটিয়া উদ্যানের শোভা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। গাছগুলি একটি বাতায়নের নিম্নেই অবস্থিত।

অন্যমনস্কভাবে মণীশ সেই দিকে চলিল। তাহার উদ্দেশ্যের কোনও স্থিরতা তখন ছিল না। গোলাপ-কুঞ্জের কাছে পৌঁছিয়া সে হাত বাড়াইয়া একটি প্রকাণ্ড গোলাপ তুলিতে যাইবে, এমন সময় তাহার প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। জানালার অপর পারে ঘরের মধ্যে দুইটি কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শ্রুত হইল। একটি প্রতুলচন্দ্রের, অপরটি—সে কান পাতিয়া শুনিল, হ্যাঁ সেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু যৌবন-ধর্ম্মের প্রভাবে এখন তাহা আরও গুঞ্জন-মাধুর্য্য অর্জ্জন করিয়াছে!

সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাহার মূর্ত্তিও কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না।

তরলিকার কণ্ঠ উচ্চ সপ্তকে উঠিয়াছিল। সে বলিল "তুমি কি বলছ শুনি। আমি এখন ঘরের বউ, বাঙ্গালীর ঘরে এমন দেখা শোনা হয় বুঝি? না, না, ছি ছি, কি যে বল!"

প্রতুলচন্দ্র মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "সে ত তোমার অজানা নয়, আগে তাকে দাদা বলেই ডাকতে। এতে দোষ হতে পারে- -বিশেষতঃ এ যুগে?"

ঝঙ্কার দিয়া তরলিকা বলিয়া উঠিল, "তার মানে? লেখাপড়া শিখে তোমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে, বুঝতে পারি নে। হিঁদুর মেয়ে বাইরের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাবে কেন? তোমার বন্ধুই বা পরস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এত ব্যগ্র কেন?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বাইরের মানুষ? ছি, ছি, এত লেখাপড়া শিখে এই বিচার বিবেচনা? মণীশ বাবু মহৎ লোক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেও সুখ আছে। আলাপ করলে আবার তোমাদের আগেকার মত ভাই বোনের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেলে কত সুখের হবে!"

তরলিকা বলিল, "বারে, আমি কি তাতে বাধা দিয়েছি? তিনি আর দাদা কি ভিন্ন? কিন্তু এঁদের মতিগতি দেখ্‌লে আমরা বাপু সহ্য করতে পারি নি।"

"তার মানে?"

"কেন; তিনি ত অনেক দিন হল এখানে এসেছেন, এ বাড়ীতেও এসেছেন। তোমাকে বল্‌তে পারেন নি, তরলিকা আমার বোন্‌ হয়, তার সঙ্গে দেখা করব? ছিঃ! ছিঃ!—তুমি আবার তার হয়ে ওকালতি করছ? না, তাকে বলগে, দেখা হবে না। তার সঙ্গে সম্পর্ক কি?"

মণীশচন্দ্রের দেহ টলিতে লাগিল। তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া

উঠিল। নাক কাণ দিয়া অগ্নি-তরঙ্গ তীব্র উচ্ছ্বাসে নির্গত হইতে লাগিল।

বুকের উপর হাত রাখিয়া সে অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল, "উঃ উঃ!" তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে লতাবিতানের মধ্যস্থ একটা লৌহাসনে বসিয়া পড়িয়া মাথাটা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিল।

ছিঃ ছিঃ কত বড় পাষণ্ড সে—কতবড় মহাপাতকী সে! হিন্দু কুল-লক্ষ্মীকে সে এতদিন কি দৃষ্টিতে তাহার পাপকলুষিত লুব্ধ চিত্তের মুকুরে নিরীক্ষণ করিয়াছে! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

সরলা বালিকা মনের আনন্দে বনকুরঙ্গীর মত তাহার সহিত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছে, জ্যেষ্ঠাগ্রজের মত তাহার নিকট কত আবদার বাহানা করিয়াছে, কতদিন তাহার ক্রোড়ে জানু পাতিয়া বসিয়া মুখের দিকে সরল নিষ্পাপ দৃষ্টিতে চাহিয়া পাঠ লইয়াছে, ব্যাখ্যা শুনিয়াছে, ভ্রমেও ত সে কখন তাহাকে সহোদরের আসন ছাড়া অন্য কোন আসনে বসায় নাই।

আর সে? অধম নীচ কলুষিত মন তাহার,—সে অনবদ্যাঙ্গী সুন্দরী কিশোরীর প্রতি চলনভঙ্গীতে, প্রতি হাস্যে রহস্যে, প্রতি চাহনীতে, প্রতি কথার আলাপে তাহার দুর্জ্জয় কামনা-কলুষিত মনের মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছিল। সে অনুরাগ যে দেবতার নির্ম্মাল্যের মত নিষ্পাপ শুভ্র সুন্দর ভগিনী-স্নেহের অনুরাগ, মূঢ়মতি সে ত তাহা বুঝিতে পারে নাই!

না, এ পাপ চিন্তা সবলে দূরে নিক্ষেপ করিতেই হইবে। যদি তাহাতে হৃদ্‌পিণ্ড উপাড়িয়া ফেলিতে হয়, তাহাতেও সে পশ্চাদপদ হইবে না—মানুষ সে, মানুষের মত দুর্জ্জয় রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে।

"এ কি, আপনি এখানে? আসুন, আসুন, আপনার ভগ্নী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—অনিল বাবু আপনাকে দেখতে না পেয়ে এই

মাত্র বাসার দিকে চলে গেলেন। আসুন—" প্রতুলচন্দ্র একরূপ হাত ধরিয়াই মণীশকে টানিয়া লইয়া চলিলেন, মণীশ হতবুদ্ধির মত যন্ত্রচালিত হইয়াই চলিল।

অন্দরে উপস্থিত হইয়া শয়নকক্ষে মণীশকে বসাইয়া প্রতুলচন্দ্র একটু উচ্চস্বরে বলিলেন, "কৈ গো, কোথায় গেলেন এঁরা, একবার এদিকে আসুন—আমি ত আর দেরী করতে পারছিনা—আটটায় ষ্টীমার।"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতমুখে ধীর মন্থর ও সলাজ গতিতে তরলিকা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার হস্তে এক থালা জলখাবার, পশ্চাতে দাসীর হস্তে আসন ও গেলাস। ঠাঁই করিয়া দিয়া হাত ধুইয়া তরলিকা গললগ্নীকৃত-বাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"আসুন মণি দা, কিছু জল খান।"

প্রতুলচন্দ্র মহা খুসী হইয়া বলিলেন, "এই ত, দেখুন ত, ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসা কি কখনও চলে যেতে পারে? যত দূরেই থাকুন মণি বাবু, আপনার ছোট বোনের মন থেকে কি আপনি দূরে থাকতে পারেন? তা হলে তুমি ওঁকে খাওয়াও দাওয়াও, গল্পোসল্পো করো, আমি চললুম—না আর এক তিলও সময় নেই।"

মণীশ ঘামিয়া উঠিল। এমন বিপদ কখনও কোন মানুষের হইয়াছে কি? পলাইবারও উপায় নাই—সেও ত অভদ্রতা, অশিষ্টতা!

"মণিদা, খান। মাসীমা কেমন আছেন?"

অতি কষ্টে কণ্ঠে স্বর আনিয়া মণীশ বলিল, "মা ভাল আছেন। আপনি—আপনি—"

তরলিকা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "বেশ মানুষ যা হোক! ছোট বোনকে আপনি? কই, হাত গুটিয়ে বসে রইলেন যে? খান, না খেলে আমি ছাড়বো না বলে দিচ্ছি।"

সেই সরলা প্রাণখোলা ছোট ভগিনীই ত বটে। মণীশ অগত্যা আহার্য্য হইতে কিছু তুলিয়া মুখে দিল। সে নতমুখেই বসিয়া ছিল।

"ওঃ আমায় দেখে লজ্জা হচ্ছে বুঝি? তা আমি আসছি চট করে পান নিয়ে। এর মধ্যে ওগুলো খাওয়া চাই বলে দিচ্ছি। আর দুখানা লুচি এনে দোবো? চা খাবেন ত?"

উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই সুন্দরী বিদ্যুৎবরণী বিদ্যুতের মতই কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। বাহিরে দালানেই দাসী দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "দাদা এলেই ঘরে নিয়ে বসাস্।"

মণীশ এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল। সত্যই ত সৃষ্টি অকরুণ নহে। এই রূপ রস স্পর্শ শব্দ গন্ধে ভরা পৃথিবী—ইহার কোথাও কিছু ত অকরুণ নহে, কোথাও ত ইহার অকৌশল নাই, কেবল মানুষের মন করুণ অকরুণের ভাঙ্গন গড়ন লীলা-বৈচিত্র্য আনিয়া দিতেছে। যেখানে যেটি দিলে সাজে, তাই দিয়া সবই সাজান আছে, মানুষ তাহার মনের মাপ কাঠি দিয়া তাহার সন্ধান পায়, আবার পায়ও না। এই ত সৃষ্টি!

প্রতিমার গড়ন, আবাহন, বিসর্জ্জন—এসবই ত সৃষ্টির ক্রমবিন্যাস। যে মানুষের মন গড়িতে আবাহন করিতে জানে, সেই মানুষের মনই ত অবস্থা ভেদে তাহার বিসর্জ্জন দিতেও জানে।

যে দেবীপ্রতিমার যে আসন, তাহাকে সে আসনে বসাইলেই সৃষ্টি করুণ, অন্যথা সবই অকরুণ, অশোভন।

"ও মা, এখনও লুচি হাতে করে ভাবছেন বসে? ছি, দাদা, অমন করলে বড় কষ্ট পাবো। ছোট বোন এত অনুরোধ করছে—"

মণীশ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি একখানা লুচি মুখে পুরিয়া দিল। তরলিকা কাছে বসিয়া এটা ওটা সেটা খাওয়াইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সে কত কথা আনিয়া ফেলিল—তাহাদের বাল্য ও কৈশোরের সেই পবিত্র

স্মৃতি-বিজড়িত কত ঘটনা, তাহার পর তাহার বিবাহিত জীবনে এই গ্রামে আসা, অধ্যাপক বীরেশ বাবুর সহিত তাঁহার পত্নী ও কন্যার সহিত আলাপ পরিচয়, গৌরীর গুণ-পনা,—কত কি কথা।

মণীশের কর্ণকুহরে সে সব কথার সমস্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছিল কি? সে তখন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত জলযোগ করিয়া যাইতেছিল আর তাহার মন তখন কোথায় কোন চিন্তারাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল! তাই যখন তরলিকা অতর্কিতভাবে তাহাকে বলিল, "মণিদা, আমার একটি কথারও কি জবাব দিতে নেই?" তখন সে চমকিত হইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় মিনতিভরা স্বরে বলিল, "না না, সবই ত শুনছি।"

"শুনছো যদি তাহ'লে একটা হাঁ না ও ত বলতে পার। অমন করে মুখ নিচু করে রয়েছো কেন? আমি কি তোমার পর।"

আঘাতের পর আঘাত, মণীশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, কষ্টে কথা জুটাইয়া বলিল, "না, না, আপনি পর হতে যাবেন কেন, অনিল—তা আজ তা হ'লে উঠি, আপনাদের এখানে—"

তরলিকা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সহাস্যাননে বলিল, "কেন আপনি আপনি করছো মণিদা—এই ত আমি তোমায় তুমি বলছি। ভাই বোনে কি এমন পরের মত কথা কয়?"

তাহার পর সে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "মণিদা, একটা অনুরোধ রাখবে বোনের?"

যাত্রার্থে প্রস্তুত হইয়া মণীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, অবনতমস্তকে বলিল, "অনুরোধ? সে কি?"

তরলিকা গাঢ় স্বরে বলিল, "হাঁ অনুরোধ! মাসীমা আমার চির-দুঃখিনী—কেবল তোমার মুখ চেয়েই সংসারে রয়েছেন। তাঁকে সুখী

করো—নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ করে তাঁর মনে কষ্ট দিও না—তাতে কখনও শান্তি পাবে না।”

মণীশের মস্তক আরও অবনত হইয়া আসিল, সে অস্ফুটস্বরে বলিল, “কি করতে বলেন আমায় ?”

তরলিকা বলিল, “সে কথা কি তুমি মনে মনে জান না ? সংসারে থাকতে গেলে হারা জেতা কান্না হাসি—সবই সইতে হয়। সব মানুষই যা চায় তা পায় না, কিন্তু তা বলে নিজের জীবনটাকে যে মানুষ হয় সে ব্যর্থ করে না। আমার দেবতুল্য স্বামী, আমার সকল গুণের আধার স্নেহময় দাদা, এরা সবাই তোমায় সংসারী দেখতে চান। মনে হয় তুমি পথ দেখালে দাদারও মতিগতি ফিরতে পারে। কিন্তু একটা ভুল ধারণা নিয়ে তুমি যদি নিজের গোঁ ধরে থাকো, তা হলে জানবো তুমি মানুষের মত মানুষ নও—তোমার স্বার্থপরতার ফলে জগতের আর পাঁচজনকে তুমি কষ্ট দিতেই এসেছো। মণিদা, আমি যে তোমার সম্বন্ধে খুব বড় ধারণাই বরাবর করে এসেছি, আমার অনুরোধ রাখবে না, দুঃখিনী মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে না ? লক্ষ্মী ভাই আমার,—বড় মুখ করে এ অনুরোধ করছি, আমার মান রাখো !”

সদা হাস্যোজ্জ্বলা তরুণীর নীলোৎপল নয়নে ধারা নামিয়া আসিল। মণীশের নয়ন শুষ্ক, মুখ-মণ্ডল পাংশুবর্ণ কিন্তু তাহার মানসসাগরে তখন যে ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল, তাহা সে ভিন্ন অন্যে কি জানিবে ? ভগ্ন কণ্ঠে বলিল, “তাই হবে তবে। অন্ধকারে যে পথ দেখিয়েছ, বোন, ধ্রুবতারার মত, সেই পথই ধরে চলবো।”

ক্ষিপ্তের মত উদ্ভ্রান্ত পাদবিক্ষেপে মণীশ কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। এতদিনে কি তাহার মানস প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল ?

সত্যইত সে কাপুরুষ, স্বার্থপর। আত্মতৃপ্তির জন্য সে অতি সঙ্গোপনে মনের নিভৃত কোণে যে মহাপাপ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, তাহার সন্ধান কেহ পাইবে না। কিন্তু যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি ত পাপের ক্ষমা করেন না। তবে তিনি পাপীকে ঘৃণা করেন না,—ইহাই কি তাহার একমাত্র সান্ত্বনা নহে?

সাভাশ

অনিলচন্দ্র বাহিরে আসিয়া মণীশকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইল। সেও ভিতরে গিয়া ভগিনী ভগিনী-পতির আলাপের কতকাংশ শুনিয়াছিল। মণীশ ত তরলিকার সহিত দেখা করিবার প্রস্তাব করে নাই, বরং সে-ই উপযাচক হইয়া দেখা-সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়াছিল। তরলিকা যে এই সহজ ব্যাপারটিকে এমন দূষ্যভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা তাহার কল্পনাতেও আসে নাই। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে, এ প্রস্তাব উত্থাপিত করা সঙ্গত হয় নাই। সে এখন পরের স্ত্রী, হিন্দু ঘরের কুললক্ষ্মী। বিশেষতঃ—না, সত্যই তাহার সাংসারিক বুদ্ধি অল্প। মণীশ কি সে আলাপ শুনিতে পাইয়াছে?

অনিলচন্দ্র দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মণীশ নিমীলিত নয়নে, নিষ্পন্দ ভাবে শয্যায় শুইয়া আছে।

অনিলের পদশব্দে মণীশ উঠিয়া বসিল। অনিল দেখিল, বন্ধুর আননে একটা বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। তাহার নয়নযুগলে অস্বাভাবিক দৃঢ়তার দীপ্তি।

মণীশ স্থির দৃষ্টিতে অনিলের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া অকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "অনিল!"

বিস্মিতভাবে অনিল বলিল, "কি?"

"বীরেশবাবু আমাদের স্বজাতি?"

"নিশ্চয়।"

"তিনি আমার মত পাত্রে তাঁর মেয়েকে দান করতে রাজি আছেন? অবশ্য বিনাপণে?"

অনিলচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিল। পরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "তোমার মত পাত্র পেলে তিনি চরিতার্থ হবেন, আমি জানি।"

"তবে তুমি আজই প্রস্তাব কর, আমি তাঁর মেয়ে গৌরীকে আমার গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত। এই মাঘ মাসের প্রথমেই যে শুভদিন থাকে, আমি রাজি।"

অনিলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত বন্ধুর মুখের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া চাহিয়া রহিল।

সত্য? ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তবে বিংশ শতাব্দীতে ভঙ্গ হওয়া সম্ভবপর? কিন্তু কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল?

অনিলচন্দ্র মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তার পর সহসা তাহার নয়নে একটা আলোকদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কি তবে মনের গতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের মূলসূত্রটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে?

মণীশ এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। সহসা সে মুখ ফিরাইয়া বন্ধুর দিকে চাহিল। দেখিল, অনিলচন্দ্র তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার সমগ্র আননে একটা রক্তোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। তার পর হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস হচ্ছে না বন্ধু? আমি সত্য কথাই বলেছি। মরীচিকা কখনো প্রকৃত শীতল জলে ভরা দীঘি হতে পারে না। এতদিন শুধু শুধু আমার মাকে, আমার পার্থিব দেবতাকে কষ্ট দিয়েছি। এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাক্। বন্ধু, আমায় ভুল বুঝো না।"

অনিলচন্দ্র বোধ হয় এতক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিল। সে মৃদু

হাসিয়া বলিল, "মেয়েটিকে একবার চোখে দেখ্‌বে না? শেষে যদি অনুতাপ আসে?"

গাঢ় স্বরে মণীশ বলিল, "কোন প্রয়োজন হবে না। আমার জীবনের প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন যখন তাকে দেখেছে, তুমি বিশ্বাস করতে পার, তখন আমি নিজের চোখে তাকে আর দেখ্‌ব না। নারী জাত সম্বন্ধে আমার বিশেষ সম্ভ্রমবোধ আছে, সে কথা বোধ হয় তুমি ভালই জান। বারবার পুরুষ তার গৃহলক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য বেগুন, পটল, শাক, মাছের মত তাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌বে, এটা আমার কাছে অসহ্য। অনিলচন্দ্র যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাকে দেখ্‌বার আর দরকার হবে না। বিশেষতঃ আগরার তাজমহলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আমি সে মূর্ত্তি দেখেছি। নতুন করে আর দেখ্‌তে যাবার দরকার নেই।"

ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "তবে তাই হোক্। তুমি বস। এ শুভ মুহূর্ত্ত আমি বৃথা যেতে দিতে পারি নে। আমি বেরুচ্ছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব।"

নিমাই এমন সময়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, এ বেলা কি রান্না হবেক?"

অনিল প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "তোর যা খুসী, নিমাই। আজ ভালরকম ভোজের ব্যবস্থা করতে পারবি?"

বিস্মিত ভাবে নিমাই বলিল, "কেন পারব না? কিন্তু আজ হলো কি কও দিনি দাদাবাবু?"

অনিল বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ খুব ভাল খবর এসেছে। তাই এখানে উৎসব করা যাবে।"

সে আর দাঁড়াইল না। ছড়িগাছা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

আটাশ

তুলসীতলে প্রদীপ দিয়া, লক্ষ্মীর পূজা সারিয়া গৌরী নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল। আজ তাহার বাবা এখনও তাহাকে নিয়মিত পাঠে সাহায্য করিবার জন্য আসেন নাই। সে পাঠ্য পুস্তকগুলি লইয়া আলোকের সম্মুখে বসিল।

কিন্তু পড়ার দিকে আজ তাহার চিত্ত যেন অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। গত কল্য মেলার চিত্র-শিল্পাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে মিসেস্ টম্‌সন্ তাহার শিল্প-প্রতিভা সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, পিতার মুখে সে তাহা শুনিয়াছিল। সহরের সাপ্তাহিক পত্র একটা অতিরিক্ত সংস্করণ আজ ছাপিয়াছে, তাহাতেও সে তাহার প্রশংসার কথাগুলি পাঠ করিয়াছে। আজ পুনঃ পুনঃ সেই কথাগুলিই তাহার মনে পড়িতেছিল।

নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার কোন বিশ্বাসই ছিল না। তাহার অঙ্কিত চিত্র যে বিশেষজ্ঞগণের কাছে প্রশংসিত হইবে, এমন দুরাশা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনের কোন প্রান্তে স্থান পায় নাই। শুধু প্রশংসা পাওয়া নহে, বাঙ্গালার উদীয়মান, সর্ব্বজন-প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সমপর্য্যায়ে তাহার আসন নির্দ্ধারিত হইয়াছে!

গৌরী ভাবিতে লাগিল, বাস্তবিক, এ কি বিস্ময়! উভয়ে একই বিষয়-বস্তু লইয়া ছবি আঁকিয়াছে! কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল?

গৌরী চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তন্ময় হইয়া গেল। নানারূপ সম্ভব অসম্ভব কল্পনা তাহার মনের মধ্যে জটলা পাকাইয়া তুলিল।

সহসা পার্শ্বের কক্ষে পিতা ও মাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার সম্বন্ধে বাবা মাকে কি বলিতেছেন? গোরী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন, "সত্যি না কি।"

পিতা বলিলেন, "অনিলবাবু এইমাত্র সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। বিকাশও তাই বলছে।"

গৌরী শুনিল, মাতা বলিতেছেন, "বিকাশ একটু আগে এসেছিল, তা কোন কথা বলে নি ত?"

"না, তখন বলে নি, এখন বল্‌ছে। পাত্র এক পয়সাও চায় না। তোমার কি মত?"

মাতা বলিলেন, "ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন খোঁজ নেবে ত?

বীরেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "অনিল ও বিকাশের পরম বন্ধু, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর! তা ছাড়া আগরার তাজ দেখতে গিয়ে রাত্তির বেলা কি বিপদে পড়েছিলুম মনে আছে ত? এই মণীশ গুহই গুণ্ডাদের হাত থেকে গৌরীকে রক্ষা করেছিল। আরও শুন্‌তে চাও?"

গৌরী চমকিয়া উঠিল। তাহার বুকের স্পন্দন দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল। মণীশ গুহ! নব-যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীই তাহার মান-মর্য্যাদার রক্ষাকর্ত্তা! তিনিই আজ তাহার পাণিপ্রার্থী!

বীরেশবাবু বলিতেছিলেম, "ছেলে গৌরীকে দেখতেও চায় না। বন্ধুদের কাছে তার গুণের পরিচয় পেয়েছে, তাই যথেষ্ট বলে মনে করে। বিকাশ আর অনিলের শৈশবের বন্ধু। মা আছেন, বিষয়-সম্পত্তি আছে; ব্যাঙ্কে নগদ টাকাও যথেষ্ট। চরিত্রটি গঙ্গার জলের মত পবিত্র। এমন পাত্র—মহাদেবের ন্যায় সুন্দর জামাই—তোমার মেয়ের তপস্যা এতদিনে বুঝি সার্থক হয়!"